দ্য আর্ট অব ওয়ার

সানজু'র 'আর্ট অব ওয়ার' অবলম্বনে

ডি এইচ খান

নোট

সামহোয়্যার ইন ব্লগে ব্লগার ডি এইচ খান ধারাবাহিক ১৪ পর্বে এই লেখাটি লেখেন। পাঠকদের সুবিধার্থে পর্বগুলো সংকলন করে ইবুক করা হলো। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে মূল লেখক ও প্রতিটি পর্বের ইউআরএল উল্লেখ করা হয়েছে।

— Your PDF Books

বিষয়সূচি

বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা
'দ্য আর্ট অব ওয়ার': লেখকের কথা	৪
'দ্য আর্ট অব ওয়ার': কে এই সানজু?	৯
প্রথম অধ্যায়: যুদ্ধ পরিকল্পনা (১-১৬)	১৮
প্রথম অধ্যায়: যুদ্ধ পরিকল্পনা (১৭-২৮)	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: ওয়েজিং ওয়ার	২৮
তৃতীয় অধ্যায়: কিভাবে আক্রমণ করবেন?	৩৩
চতুর্থ অধ্যায়: রণকৌশলগত বিন্যাস	৩৯
পঞ্চম অধ্যায়: কমান্ডার হিসেবে আপনি কতটা শক্তিশালী?	৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা	৫১
সপ্তম অধ্যায়: মেনুভার	৫৯
অষ্টম অধ্যায়: চিরায়ত রণকৌশলে নয়টি ব্যতিক্রম ভাবনা	৬৮
নবম অধ্যায়: দ্য আর্মি অন দ্য মার্চ- ১	৭৩
নবম অধ্যায়: দ্য আর্মি অন দ্য মার্চ- ২	৭৬
দশম অধ্যায় : দ্য টেরেইন- ১	৮৪
দশম অধ্যায়: দ্য টেরেইন- ২	৮৮
একাদশ অধ্যায়: নয় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি-১	৯৬
একাদশ অধ্যায়: নয় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি- ২	১০৪
দ্বাদশ অধ্যায়: এটাক বাই ফায়ার	১১১
ত্রয়োদশ অধ্যায়: গুপ্তচর নিয়োগ	১২১

'দ্য আর্ট অব ওয়ার': লেখকের কথা

সানজু এবং তার 'আর্ট অব ওয়ার'কে বাতিল আর অচল বলার লোক এই দ্বাবিংশ শতকে আপনি অনেক পাবেন। যেমন খ্রীস্টের জন্মেরও পাঁচশ বছর আগে এই লোক ফরমাইছেন, ভুলেও কেউ যেন দেয়াল দিয়ে ঘেরা কোন শহর আক্রমণ করতে না যায়। এই যুগে দেয়াল ভাঙ্গার জন্য হাতুরি-বাটাল লাগে না, বোমা মেরেই উড়িয়ে-গুড়িয়ে দেয়া যায়। তাইলে উনার এই ফরমানের কি আর কোন দাম থাকল! তারপরও কেন যে লোকে এই সানজু আর তার আর্ট অব ওয়ার নিয়া বিতং করে! এই বই এখনও অনেকে পড়ে, আর্মির লোকেরা বেশি পড়ে, ব্যবসায়ী আর স্ট্র্যাটেজিস্টরাও পড়ে! কারণটা কি?

আমার নিজের ধারণা ছিল আগেকার দিনে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, আর যুদ্ধের ময়দানে ঢাল, তলোয়ার, তীর, ধনুক নিয়া দুই পক্ষ হা-রে-রে বলে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পরত। যার সৈন্য সংখ্যা আর সৈন্যের কোয়ালিটি যত ভাল, দিন শেষে সেই জিতত। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন আর কিছু পড়ার না পেয়ে সানজু র 'দ্য আর্ট অব ওয়ার' নামের চটি বইটা পড়ে ফেললাম। তের অধ্যায়ের একটা চটি বই। শুরুতে মনে হল ডেল কার্নেগি টাইপ উপদেশের বই, এইটা কইরো না, ঐটা করলে সেইটা হবে টাইপ।

কিন্তু বই শেষ করার পর আমার প্রথম উপলব্ধি হইল, এই বই খ্রীস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে লেখা!!! ক্যামনে কি!!! যুদ্ধে

ট্যাকটিক্স বলতে যে একটা জিনিস আছে আর ঐ আমলের লোকেরা যে এই বিদ্যায় কতটা পারদর্শী ছিল তা জেনে আমার এতোদিনের জাজমেন্টাল ভুল ধারণার জন্য কিঞ্চিত লজ্জাই পাইলাম।

এই বই আমাদের জন্য অবশ্যপাঠ্য না। তাই শখ করেই পড়া। মজার ব্যাপার হল অনেকদিন পর পর পড়ি আর প্রতিবারই সানজুর স্ক্রিপ্টের নতুন নতুন এঙ্গেল খুজে পাই। যেমন ধরেন এই দেয়াল দিয়ে ঘেরা শহর আক্রমণ করতে সানজুর বারণের কথা।

আগের দিনে শহরকে দেয়াল দিয়া ঘিরে দেয়া হত যেন শত্রু বিনা বাধায় শহর দখল করে ফেলতে না পারে। যুদ্ধ লাগলে শহরের ভেতর অস্ত্রপাতি আর রসদ নিয়া আরামসে দিনের পর দিন যুদ্ধ চালায়া যাও। প্রতিপক্ষের অপশান একটাই, শহর ঘেরাও দাও। কিন্তু একবার ভাবেন, আপনি কয়েকশ মাইল দূর থেকে এসে কতদিন একটা শহর অবরোধ করে রাখবেন? এম্নিতেই ত্যাদড় শহরবাসি চান্স পাইলেই তীর-পাথর-গরম পানি মারে আপনার তাবুর উপর। তার উপর আপনার রসদ আনতে হয় সেই একশ মাইল দূর থিক্ক্যা। দেয়াল বেয়ে উঠতে গেলে অথবা দেয়াল ভাংতে গেলেই উপর থেকে বৃষ্টির মত তীর নেমে আসে।

আপনি সেনাপতি, যুদ্ধ করতে আসছেন, দাবা খেলতে না, যে দিন শেষে দুই ঘুটি নিয়া জিতলেই চলবে। নিজের সৈনের প্রতি আপনার মায়া আছে আর আপনি জানেন যে অনন্তকাল যুদ্ধ

করতে এরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়নাই। যথারীতি আপনি বলটা এইবার আপনার রাজার কোর্টে পাস কইরা দিলেন। রাজা হিসেব নিকেষ করে দেখল এন্ড স্টেটে তার লাভ তেমন নাই। শত্রুর দেয়ালের পাশে বইসা পাহাড়া দেওয়ার চেয়ে অর ব্যবসা বানিজ্যের রাস্তায় ঠেক দেওয়া লাভজনক আর ফায়দা একই। তো কয়েকদিন হম্বিতম্বি দেখায়া পরের চালান রসদ পাঠানোর আগেই সেনা ফিরত নিয়া নিবেন। আর যদি ব্যাপার হয় ইগো, তাইলে আরো কিছু সৈন্য পাঠায়া দিবেন। আপনি একটা ক্লিয়ার মেসেজ পাইলেন। লা পরোয়া একটা ঝটিকা আক্রমণ করবেন, পঙ্গপালের মত আপনার সেনা মরবে, প্রতিপক্ষকেও মারবে। একসময় শহরের পতন হবে, আপনি নিজ হাতে আপনার রাজার ঝান্ডা উড়ায়া রাজার কাছে বার্তা পাঠাবেন, মিশন একোমপ্লিশড! রাজা খুশি হয়ে আপনাকে আরেকটা করকরা নতুন আর্মি গিফট করবেন।

এতো গেল আদ্দিকালের কথা। এই কালে তো দেওয়ালের কোন বেইলই নাই। তাইলে কি? এই কুইজটা বুজতে হলে আপনারে একটু কাল্পনিক হতে হবে। আগে শহরের ডিফেন্সে যেই দেওয়ালটা ছিল অইরকম একটা দেওয়ালতো আর সারা দেশের চারদিকে দেয়া যায় না। দরকারও নাই। কারণ শত্রুওতো এখন আর ঢাল-তলোয়ার-তীর-বল্লম নিয়ে আসেনা। এখনকার যেকোন অফেন্সিভ শুরু হয় এয়ার স্ট্রাইক দিয়ে। প্রথমেই একটা সাকসেসফুল এয়ার অপারেশন চালায়া সে আপনারে লুলা বানায়া নিবে। তারপর সে তার গ্রাউন্ড ফোর্সটা পাঠাবে আপনারে পিস মিলে সাবার করতে। আর যদি আপনে

শত্রুর অই এয়ার অপারেশনটারে বানচাল করে দিতে পারেন, তাইলেই কেল্লা ফতে। শত্রু এইবার তার গ্রাউন্ড অফেন্সিভ আদৌ কন্টিনিউ করবে কিনা, সেইটা একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। এইফাকে আপনি দরকষাকষি করেন, ইউএন ডাকেন, তেজ বেশি থাকলে আপনি কাউন্টার অফেন্সিভেও যাইতে পারেন।

মোদ্দা কথা হল শত্রুর এয়ার অফেন্সিভটা ঠেকানোর জন্য আপনার একটা দেওয়াল দরকার। এই দেওয়ালটারে এই জামানায় বলে এয়ারডিফেন্স। তো সানজু ভুল কইছে কই? আপনার যদি একটা আধুনিক এয়ারডিফেন্সের দেওয়াল থাকেই, তাইলে উনি আপনাকে না বরং আপনার শত্রুকে বলতেছেন, "প্রাচীরবেস্টিত নগর আক্রমণ করা সমীচীন নহে।"

এই বই আর্মি লাইব্রেরির শেলফে সযত্নে পরে থাকে। নানান অজুহাতে আমাদের অনেকেই পড়ার আগ্রহ পাইনা। গ্যারান্টি দিতে পারি, পরের যুদ্ধটা কিন্তু ৭১ এর চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। আর আমাদের মত ছোট রাস্ট্রে সেনাবাহিনী একা কখনও যুদ্ধ করেনা, জনতাকে সম্পৃক্ত হতেই হয়।তাই যুদ্ধের অ আ ক খ জানা-বোঝা কিন্তু আমাদের সবার জন্যই জরুরি।

পুনশ্চঃ
অনেকদিন ধরেই এই বইটা অনুবাদের চেষ্টা করে যাচ্ছি। ফিরিঙ্গি প্রকাশক এনওসি ও দিছে। কিন্তু কাজ আগায় না।

নিজেই ভাল বুঝি না, ভাবানুবাদ বা রুপান্তর ক্যামনে করি। তারপরও মাঝে মাঝে আরজ আলি মাতুব্বরের কথা মনে পরে, ভরসা পাই। দেখি প্রজেক্টটা শেষ করতে পারি কিনা। ভাবতেছি ব্লগেই এপিসোড বাই এপিসোড লিখব। দোয়া রাইখেন।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29967297

'দ্য আর্ট অব ওয়ার': কে এই সানজু?

"Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat."

সানজু ছিলেন চিঙ্গ (Ch'i)রাজ্যের বাসিন্দা। সমর কৌশলের উপর তার লেখালেখির সুবাদে একদিন তিনি অউ (Wu)এর রাজা হো-লু (Ho-lü) র ডাক পেলেন। রাজা হো-লু আগেই সানজুর 'দ্য আর্ট অব ওয়ার' পড়েছিলেন, তাই এইবার সানজুর সৈন্যদল কমান্ডের একটা মহড়া দেখার খায়েস করলেন। শর্ত হল এই মহড়ায় সৈন্য হিসেবে থাকবে রাজার হেরেমখানার রুপসী নর্তকিরা।

সানজু বললেন, 'তথাস্তু'।

সানজু এক চৈনিক মার্সেনারি জেনারেল, স্ট্রেটেজিস্ট আর দার্শনিক। লোকে তাকে সান জি নামেও ডাকে। বাঁশের চাটাই এর ওপর লিখে যাওয়া তার বই 'দ্য আর্ট অব ওয়ার' প্রায় দুহাজার বছর ধরে যুদ্ধবিদ্যার ছাত্রদের অন্যতম পাঠ্য। মাও সে তুং, গিয়াপ আর হালের ম্যাক আর্থারের মত সেনানায়কেরাও নাকি তার এই বই থেকে প্রেরণা নিয়েছেন বলে স্বীকার করে গেছেন।

যাহোক, যথাসময়ে রাজার হেরেমখানা থেকে একশ' আশি জন (মতান্তরে তিনশ) রূপবতী নর্তকি হাজির হল আর সানজু

ঝটপট তাদের দু’টি উপদলে ভাগ করে ফেললেন। দুই উপদলের কমান্ডার হল রাজার প্রিয়তম দুই নর্তকি।

প্রথমেই সানজু তাদের শেখালেন কিভাবে অস্ত্র ধরতে হয়। তারপর বললেন, ‘আমি যখন কমান্ড দিব, “সামনে”, তখন আপনারা আপনাদের হৃদপিণ্ড বরাবর সামনের দিকে অস্ত্র তাক করবেন; আবার আমি যখন বলব “বামে”, তখন বাম দিকে ফিরবেন; যখন বলব “ডানে” তখন ডানে ফিরবেন; আর যখন বলব “পেছনে”, তখন সবাই উলটা ঘুরে পেছনদিকে ফিরবেন।’

নর্তকিরা সবাই বলল, 'বুঝছি, বুঝছি।’ তারপরও সানজু আরো তিনবার তার কমান্ডগুলো রিপিট করলেন আর পাঁচবার পুরো ড্রিলটা ব্যাখ্যা করলেন। অবশেষে তিনি যখন সবাইকে ডানে ফেরার কমান্ড দিলেন, ওমনি নর্তকিরা সবাই হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। সানজু বললেন, 'আন্ডারকমান্ড যদি বুঝতেই না পারে কোন আদেশে তার কি করতে হবে , তাহলে সেইটা কমান্ডারের নিজের দুর্বলতা।’

সুতরাং তিনি তার কমান্ডগুলো আবার তিনবার বললেন এবং পুরা ড্রিল আরো পাঁচবার বুঝায়া বললেন। তারপর সবাইকে এবার বামে ফেরার আদেশ দিলেন। আবারো নর্তকিরা সবাই হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। এইবার সানজু বললেন, ‘আদেশে ঘাপলা থাকলে অবশ্যই সেনাপতিকে দোষ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ঘাপলা দূর করার পরও যদি তার আদেশ পালিত না হয়, এর দায় কর্মকর্তাদের (officers)।’ সুতরাং তিনি দুই

উপদলের নেতৃত্বে থাকা দুই নর্তকির কল্লা কাটার নির্দেশ দিলেন।

রাজা হো-লু তার টেরাসে বসেই মহড়া দেখছিলেন। প্রিয় দুই নর্তকির কল্লা কাটার উপক্রম দেখে তিনি সত্বর সানজুর কাছে দূত পাঠালেন যেন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু সানজু জানালেন, 'জাহাপনার নির্দেশেই আমি সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি, আর একজন সেনাপতি তার নিজ সেনাবাহিনী যথাযথভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে জাহাপনার সব অনুরোধ রাখতে বাধ্য নন।' অতএব ঐ দুই নর্তকির কল্লা গেল এবং তাদের পরবর্তি জৈষ্ঠ দুজন দুইদলের নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিল।

এরপর সানজুর আদেশ দিতে দেরি কিন্তু আদেশ পালনে কোন খুঁত পাওয়া গেল না। তখন সানজু রাজার কাছে বার্তা পাঠালেন যে, এখন তার সেনাদল জাহাপনার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত। এরা এখন জাহাপনার জন্য জান কোরবান করতেও রেডি। ঈষৎ বেজার রাজা হো-লুর কি আর তখন সৈন্য পরিদর্শনের মুড থাকে? সানজু বললেন, 'জাহাপনারা শুধু ফাঁকা বুলি শুনতেই পছন্দ করেন। এর বাস্তবায়নটা আর দেখতে চাননা।'

রাজা হো-লু কিন্তু সেনাপতি হিসেবে সানজুর সক্ষমতা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাকে তার সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরে সানজু পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্র চু (Ch'u) কে পরাস্ত করে ইং (Ying) পর্যন্ত এগিয়ে যান; উত্তরে তিনি চি (Ch'i) আর চিন (Chin) রাষ্ট্রকেও পরাভুত

করেন। চৈনিক সামন্তরাজদের তালিকায় অউ (Wu) রাজ্যের খ্যাতির অনেকটাই আদতে সানজুরই অর্জন। উয়েহ চুয়েহ শু এর ভাষ্যমতে অউ রাজ্যের প্রধান ফটকের দশ লি দুরেই বিশাল যে সমাধিটা দেখা যেত, তা ছিল সানজুর।

সানজুর মৃত্যুর এক শতাব্দীরও পরে সান পিনের জন্ম। তিনি ছিলেন সানজুর বংশধর। সামরিক শিক্ষায় সান পিন আর পাং চুয়ান ছিলেন সহপাঠী। একসময় পাং চুয়ান অয়েই (Wei) রাজ্যের রাজা হুইএর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পান। পাং চুয়ান জানতেন যে সমরকলায় তিনি সান পিনের সমকক্ষ নন। তাই ঈর্ষান্বিত পাং চুয়েন নিজ প্রতিদ্বন্দীকে নিশ্চিহ্ন করতে সাজানো মামলায় সান পিনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শাস্তি স্বরুপ তখনকার নিয়ম অনুযায়ী সান পিনের দু'পা কেটে নেয়া হয় আর মুখে উল্কি এঁকে দেয়া হয় দাগী হিসেবে।

পরে সান পিন চি রাজ্যের রাজদুতের সহায়তায় গোপনে অয়েইর রাজধানী তা লিয়াং থেকে পালিয়ে চি এর সেনাপতি তিয়েন চি এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিয়েন চি প্রায়ই চি এর রাজকুমারদের সাথে ঘোড়দৌড়ে বাজি লাগতেন। সান পিন লক্ষ্য করলেন যে এই ঘোড়দৌড়ে মুলত তিন শ্রেনীর ঘোড়া পরস্পরের সাথে প্রতিযোগীতা করত এবং কৌশলের সাথে ঘোড়া নির্বাচন করতে পারলে বাজিমাত করা সম্ভব। তারই পরামর্শে পরের প্রতিযোগীতায় তিয়েন চি এক সহস্র স্বর্নমুদ্রা বাজি লাগলেন।

প্রতিযোগীতার দিন সান পিনের পরামর্শে তিয়েন চি প্রথম রেসে রাজার সেরা ঘোড়ার বিপরীতে নিজের দুর্বলতম ঘোড়াটাকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পাঠালেন, এবার দ্বিতীয় রেসে রাজার দ্বিতীয় সেরা ঘোড়াটার সাথে লড়তে পাঠালেন নিজের সেরাটাকে; আর তৃতীয় রেসে নিজের দ্বিতীয় সেরাটা লড়লো রাজার দুর্বলতমটার সাথে। ফলাফলে প্রথম রেসে হারলেও বাকি দুটি রেস তিয়েন চি জিতে নিলেন আর সঙ্গে জিতলেন এক সহস্র স্বর্নমুদ্রা।

এঘটনার পর তিয়েন চি সান পিনকে রাজার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর রাজা উয়েই তাকে নিজের সামরিক উপদেষ্টা করে নিলেন। পরে যখন চাও রাজ্য অয়েই রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চি রাজ্যের সাহায্য কামনা করল, চি এর রাজা উয়েই তখন সান পিনকে সেনাপতি করে সৈন্য পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। একজন প্রাক্তন দাগী আসামি হিসেবে সান পিন সে প্রস্তাব সসম্মানে প্রত্যাখান করলে, রাজা উয়েই তিয়েন চি কে সেনাপতি মনোনিত করে সান পিনকে তার চীফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেন।

তিয়েন চি চাইছিলেন সেনাদল নিয়ে সোজা চাও এর দিকে এগিয়ে যেতে। সান পিন বললেন, ‘এলোমেলো সুতার গিট খুলতে যেমন পুরো সুতার জটটা একবারে ধরতে নেই, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহের মিমাংশা কখনও যুদ্ধ-কুঠার হাতে করতে যেতে নেই। আঘাত যদি করতেই হয় তবে শত্রুর মুলে অথবা তার অরক্ষিত অংশে আঘাত কর। যখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা

অচলাবস্থা (stalemate) বিরাজ করে, তখন পরিস্থিতি আপনাতেই সমাধা হতে শুরু করে। এইমুহুর্তে অয়েই আর চি এঁকে অন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়েরই সৈন্যরা বিদ্ধস্ত, আর তাদের বাড়ীতে দুর্বল আর বৃদ্ধেরাও ক্লান্ত। তাই চাও নয় বরং অয়েইর রাজধানী তা লিয়াং এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ, কেননা তা লিয়াং এখন প্রায় অরক্ষিত। সেক্ষেত্রে নিজ রাজধানী বাঁচাতে অয়েইরা নিরুপায় হয়েই চাওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। আর এভাবেই চাও অবরোধেরও যেমন নিস্পত্তি হবে তেমনি অয়েইকেও পরাজিত করা সম্ভব হবে।'

তিয়েন চি সান পিনের এই পরামর্শ মতই কাজ করলেন। ফলে বাধ্য হয়ে অয়েই সেনাবাহিনী হান তাই (চাও র রাজধানী)অবরোধ বাদ দিয়ে নিজ রাজধানী তা লিয়াং রক্ষার্থে রওয়ানা দিল এবং পথিমধ্যে কুএই লিং এর কাছে এসে চি সেনাদের কাছে ভীষনভাবে পরাস্ত হল।

পনের বছর পর চাওদের সাথে মিত্রতা করে অয়েই রাজ্য এবার হান রাজ্য আক্রমণ করল। হান রা তখন চি রাজ্যের সহায়তা চাইলে, চি এর রাজা যথারীতি সেনাপতি তিয়েন চি কে তা লিয়াং আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। খবর পেয়ে অয়েই সেনাপতি পাং শুয়ান হান আক্রমণ বাদ দিয়ে ফের নিজ রাজধানী বাচাতে ছুটলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে চি সেনাবাহিনী অয়েই রাজ্যে প্রবেশ করে তা লিয়াং এর দিকে এগুচ্ছে।

এবার সান পিন তিয়েন চি কে বললেন, ‘অয়েই সেনারা স্বভাবতই হিংস্র, সাহসী, আর তারা চি সেনাদের কাপুরুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। রননীতি (The Art of War) অনুযায়ী, কোন সেনাবাহিনী যদি একশ লি (এক লি সমান ৫০০ মিঃ প্রায়) দূর হতে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ জিততে চায় তবে সেই বাহিনীর অগ্রগামী দলের (van)কমান্ডার শত্রুর হাতে ধরা পরবেন, আর যদি পঞ্চাশ লি দূর হতে যায় তবে তার অর্ধেক মাত্র সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছাবে।’ এরপর পাং শুয়ান কে বিভ্রান্ত করতে সান পিনের বুদ্ধিতে চি সেনাদের নির্দেশ দেয়া হল যেন তারা অয়েই রাজ্যে প্রবেশের পর প্রথম রাতে এক লাখ, দ্বিতীয় রাতে পঞ্চাশ হাজার আর তৃতীয় রাতে ত্রিশ হাজার রান্নার চুলা জ্বালায়।

পাং শুয়ান টানা তিনদিন তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন। পথেই তিনি খবর পেলেন যে প্রতিরাতেই শত্রু শিবিরে রান্নার আগুনের সংখ্যা কমে আসছে আর পরমানন্দে ভাবতে লাগলেন, চি সেনারা সত্যই কাপুরুষ। সবে তিনদিন হল তারা আমার দেশে ঢুকেছে, এরইমধ্যে আর্ধেকের বেশি অফিসার আর সৈন্য শিবির ছেড়ে ভেগেছে। এরপর পাং শুয়ানের আর তর সইছিল না, তাই সে তার ভারী পদাতিকবাহিনী আর রসদ পেছনে ফেলে শুধু হালকা বর্মের সেনাদল নিয়ে চি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সান পিন হিসেব কষে দেখলেন সন্ধ্যে নাগাদ পাং শুয়ান মালিং এ এসে পৌছুবেন।মালিং এর সরু রাস্তার দুপাশে খাঙ্খন্দকে

ভরা আর এম্বুশের জন্য আদর্শ।সান পিন রাস্তার পাশে চোখে পড়ার মত বিশাল একটা গাছের সবটা বাকল তুলে নিয়ে এর গায়ের উপর লিখলেন, 'পাং শুয়ান এই গাছের নিচে মৃত্যু বরন করবেন।' এরপর তিনি রাস্তার দুইপাশে দশ হাজার ঝানু তীরন্দাজ নিয়ে এম্বুশ পাতলেন, আর বলে দিলেন রাতে তাদের সামনে যেখানটাতেই আগুন জ্বলে উঠতে দেখবে, সবাই সেই আলো লক্ষ্য করে যেন তীর ছোড়ে।

পাং শুয়ান রাতে গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় গাছের গায়ে কিছু একটা লেখা আছে বলে আঁচ করতে পেরে, লেখাটা ভাল করে পড়ার জন্য মশাল জ্বালাতে বললেন। তিনি লেখাটা পড়ে শেষ করার আগেই একযোগে দশ হাজার তীর ছুটে এল। পাং শুয়ানের বুঝতে দেরী হলনা যে তার সেনাদলের জয়ের আর কোন আশা নেই। তখন তিনি নিজের টুটি চিরে আত্মহত্যা করলেন, আর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের আগে বললেন, 'অবশেষে আমি সেই হতচ্ছারাটার খ্যাতি বাড়াতে অবদান রেখে গেলাম।'

সান পিন এই জয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমগ্র অয়েই সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন এবং তাদের ভাবী উত্তরসুরী সেন কেও বন্দি করেন। এরপর তিনি চি ফিরে যান। একারনেই সান পিনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরে আর তার স্ট্রেটেজি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলোচিত হতে থাকে।

সানজুর জীবনীর সাথে লেজুর হয়ে সান পিনের জীবনীটাও চলে আসা কোন কাকতালীয় ঘটনা না। ধারণা করা হয় সানজু থেকে আর্ট অব ওয়ারের যে সংকলন শুরু হয়, তা সান পিনে

এসে পুর্নাংগ রুপ পায়, যা অধুনা বিশ্বে সানজুর 'দ্য আর্ট অব ওয়ার' নামে টিকে আছে।

পুনশ্চঃ
'দ্য আর্ট অব ওয়ার' নামে ম্যাকিয়েভেলি আর জোমিনিরও বই আছে। দয়া করে গুলিয়ে ফেলবেন না।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29967338

দ্য আর্ট অব ওয়ার
প্রথম অধ্যায়: যুদ্ধ পরিকল্পনা (১-১৬)

কিছু মানুষ আছে যারা অন্য দেশের সাথে যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারে না, ইংরেজিতে এই পদের লোকেদের বলে 'হক'। দুইপক্ষের মতের অমিল একটা সংকট, আর এই সংকট সাধারণত ডিপ্লমেসি দিয়ে সমাধা করার কথা। কিন্তু কখনো কখনো ডিপ্লমেটরা ফেইল মারেন অথবা পলিটিশিয়ানরা তাদের ফেইল মারতে বাধ্য করান, আর তখনই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধ মানেই কিন্তু বল প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন মেনে নিতে বাধ্য করা। মনে রাখার বিষয় হল, যুদ্ধ একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং যেকোন যুদ্ধের নেপথ্যে কুটনৈতিক ব্যর্থতা একটা বড় কারণ।

সানজুর তের অধ্যায়ের প্রথম এই অধ্যায়কে ইংরেজিতে বলে 'প্রাইমারি ক্যালকুলেশন' বা 'এস্টিমেশন' অথবা 'লেইং প্ল্যানস।' সহজ কথায়, যুদ্ধে যাবেন কিনা কিংবা যুদ্ধে জড়ানোটা আদৌ ঠিক হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নিতে হয়, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়েই সানজু আলোকপাত করেছেন।

১.

সানজু কহেন, *"যুদ্ধ একটি রাষ্ট্রের পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কেননা এ হল জীবন অথবা মৃত্যুর প্রশ্ন; এ পথ বেঁচে থাকবার*

অথবা সর্বনাশের। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক।"

মন চাইলেই আপনি যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারেন না। যুদ্ধের জন্য প্রথমেই আপনার দরকার একটা সেনাবাহিনী। সেই সেনাবাহিনী একরাতে বানানো সম্ভব না, বেতন-রেশন দিয়া দিনের পর দিন এদের ট্রেনিং দিতে হয়, অস্ত্রপাতি কিনে দিতে হয়। ধরা যাক আপনার এইরকম একটা সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু ভুল প্রতিপক্ষের সাথে লেগে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় যুদ্ধ করতে গেলেন। ব্যাস, ম্যাচ হারার জন্য খুব বেশি এফোর্ট লাগে না, কিন্তু জিতার জন্য সানজুর *"পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক"* কথাটা অপ্তবাক্য হিসেবে মনে রাখা জরুরী।

২

তাই পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য কতটা অনুকুল তা আপনি পাঁচটি মৌলিক ফ্যাক্টর এর আলোকে যাচাই করবেন। প্রথম ফ্যাক্টরটা হল 'মোরাল ইনফ্লুয়েন্স' বা নৈতিক প্রভাব। নেতৃত্ব যদি নৈতিক প্রভাব আর উপযুক্ত কারণ নিশ্চিত করতে পারে, তবে জনতা ভয়কে জয় করে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবে।

যুদ্ধে 'রাইচান্সেজ অব কজ' বা সন্তোষজনক কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। '৭১ এ পাক বাহিনী এই ব্রিফিং পেয়ে যুদ্ধ শুরু করল যে, পূর্ব পাকিস্তানে সব বিধর্মী বেঈমানদের বাস, ওদের নির্বিচারে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কিছুদিন পরই সাধারণ সৈন্যরা টের পেয়ে গেল যে, আদতে তারা বিধর্মী নয় বরং

মুসলমানদেরই মারছে। ব্যাস, দ্বিধা ঢুকে গেল, নেতৃত্বের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস জন্ম নিল। পাক আর্মি যথেষ্ট প্রশিক্ষিত আর উপযুক্ত হয়েও শুধুমাত্র যুদ্ধ করার মত সন্তোষজনক কোন কারণ না পায়ে, দ্রুত তাদের সৈনিকসুলভতা হারাল এবং পরাজিত হল। অথচ রাজা লিওনিডাস মাত্র ৩০০ স্পার্টান যোদ্ধা নিয়ে থার্মোপেলি গিরিপথে পার্শিয়ানদের ঘাম ছুটিয়ে ইতিহাসে নাম করে নিয়েছেন। এছারাও প্রায় প্রত্যেকটা ইসলামিক যুদ্ধেও খলিফা আর সেনাপতিদের নৈতিক প্রভাবের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হল, আবহাওয়া। প্রথমে নেপলিয়ন পরে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে হেরেছে। আদতে হেরেছে রাশান ঠান্ডার কাছে। রাশিয়ার মাটিতে রাশিয়াকে হারানোর মত ট্রেনিং অথবা লজিস্টিক কোনটাই না থাকায় হিটলারের অপারেশন বার্বারোসা হয়ে গেল ইতিহাসের অন্যতম ভুল আর মর্মান্তিক সামরিক অভিযান।

আপনার আর্মি যেখানে যুদ্ধ করবে, সেখানকার আবহাওয়ার সাথে কত দ্রুত খাপ খাওয়াতে পারবে, কতদিন টিকে থাকতে পারবে আর আপনি কতদিন রসদ যুগিয়ে যেতে পারবেন, তার উপর জয়-পরাজয় অনেকটাই নির্ভরশীল। রাশিয়ার যেমন আছে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শীত, আমাদেরও তেমনি আছে আষাঢ়-শ্রাবন। বর্ষাকালে এসে বাংলার মাটিতে যুদ্ধ করে জিতে যাবার মত আর্মি এখনো বিশ্বের কোন দেশেরই নেই।

টেরেইন আরেকটা বিশাল ফ্যাক্টর। ইংরেজি টেরেইন শব্দের প্রাসঙ্গিক মানে হল একটা যুদ্ধক্ষেত্র সংলগ্ন গাছপালা, পাহাড়-উপত্যকা, নদ-নদী, বসতি ইত্যাদি। দুইটা নদী পার হয়ে যদি আপনাকে আক্রমণ করতে হয়, আপনার হিসেব থাকতে হবে দুইটা সামরিক ব্রিজ বানানোর ক্যাপাসিটি আপনার আছে কি নাই, কেননা যুদ্ধের সময় শত্রু ব্রিজ ভেঙ্গে দিতে পারে। আপনি যেখানে আসল যুদ্ধটা করতে চাচ্ছেন, সেখানে আপনার ফোর্স কন্সেন্ট্রেট করতে হবে, যেন অই বিশেষ সময় আপনার ফোর্স রেশিও শত্রুর চেয়ে বেটার থাকে। তো সেই মোক্ষম সময়ে কন্সেন্ট্রেশন এচিভ করতে, কোন পথে কোথা থেকে কোন ফোর্স আনাবেন, সেইটা ঠিক করতেও আপনাকে টেরেইন জানতে হবে। টেরেইন জানতে হবে কোথায় গিয়ে বিশ্রাম নেবেন, কোথায় শত্রুকে ক্যানালাইজ করবেন অথবা কোন পথে পিছু হটবেন তা ঠিক করতেও।

চতুর্থ ফ্যাক্টর হল সেনাপতিদের কোয়ালিটি। বিচক্ষণ কমান্ডারেরা পরিবর্তিত পরিস্থিতি দ্রুত অনুধাবন করে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আর সুযোগ কাজে লাগাতে জানেন। নেপোলিয়ন নাকি আগেভাগেই শত্রুর চাল ধরে ফেলতে পারতেন, 'ডেজার্ট ফক্স' রোমেলও নাকি পারতেন। প্যাটন যেবার পেঞ্জার ডিভিশনকে হারিয়েছিলেন সে যুদ্ধে রোমেল ছুটিতে ছিলেন। অচিনলেক এল-আলামিনের যুদ্ধে তিস্টাতে পারছিলেন না, চার্চিল তার বদলে পাঠালেন মন্টগোমারি'কে, মন্টগোমারি ঠিকই রোমেলকে ঝেটিয়ে বিদায়

করেছিলেন। সেনাপতিদের নামে এবং উপস্থিতিতে যুদ্ধক্ষত্র প্রভাবিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

পঞ্চম ফ্যাক্টর হল ডক্ট্রিন। যে সেনাবাহিনীর ইউনিট, র‍্যাঙ্ক স্ট্র্যাকচার, চেইন অব কমান্ড আর লজিস্টিক সিস্টেম যত উন্নত, সে সেনাবাহিনীর জয়ের সম্ভাবনা তত বেশি। যুদ্ধক্ষেত্রে পিছুহটা মানেই হেরে যাওয়া নয়। তারপরও সুশৃঙ্খল আর সুপ্রশিক্ষিত সেনাদল পশ্চাৎ অপসরণ করে আবার ফিরে আসে, দুর্বল সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

৩

সানজু দাবি করেন, *"এমন কোন জেনারেল পাওয়া যাবে না যিনি এই পাঁচটা বিষয় সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু যারা এই পাঁচ বিষয় ভালভাবে আত্মস্থ করতে পারেন, তারাই বিজয়ী হন, আর যারা পারেন না, তারাই হেরে যান।"*

যুদ্ধের পরিকল্পনার সময় যদি আপনি বলতে পারেন কোন পক্ষের নেতৃত্বের নৈতিক প্রভাব বেশি, কার সেনাপতি বেশি সক্ষম, কারা আবহাওয়া আর টেরেইনের সুবিধা বেশি পাবে, কাদের ডক্ট্রিন অধিক ফলপ্রসু, কাদের সেনারা বেশি উজ্জীবিত, কাদের অফিসার আর সৈন্যরা বেশি প্রশিক্ষিত, এবং কাদের প্রশাসনে পুরস্কার আর তিরস্কার সমুচিত ভাবে নিশ্চিত করা হয়; তাহলে আপনিও ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবেন, কে জিতবে আর কে হারবে। সুতরাং সানজুর দাবী, জেনেশুনে যে জেনারেল তার এই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে, তাকে অনতিবিলম্বে অবসরে পাঠানো হোক, কারণ সে ইতোমধ্যেই একজন হারু জেনারেল,

এইটা যুদ্ধে হেরে প্রমাণের কোন দরকার নাই। আর ভাল জেনারেলরা তার এই শিক্ষাকে বিবেচনায় রেখে উদ্ভুত পরিস্থিতি সামলে ঠিকই বিজয় ছিনিয়ে আনবে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29969553

প্রথম অধ্যায়: যুদ্ধ পরিকল্পনা (১৭-২৮)

"All war is based on deception"

৪

ইংরেজি 'ডিসেপসন' শব্দের অর্থ ধোঁকা, প্রতারণা অথবা ছলনা। বাইজান্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুখের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইয়ারমুখ প্রান্তরে পশ্চিম দিকে মুখ করে পজিশন নিয়েছিলেন। একে বলে 'পজিশনাল এডভান্টেজ' বা অবস্থানগত সুবিধা। এর ফলে সকাল থেকে দুপুর অবধি প্রতিপক্ষ বাইজান্টাইনদের চোখে সূর্য পড়ত, ফলে দূর থেকে তারা মুসলিম আর্মির সঠিক সংখ্যা ঠাহর করতে পারত না। উপরন্তু খলিফা ওমর নির্দেশ দিলেন যেন প্রতিদিন সকালের দিকে মুসলিম সেনারা ছোট ছোট দলে কিন্তু ঢাক ঢোল পিটিয়ে খালিদের আর্মিতে যোগ দেয়। ফলে বাইজান্টাইনরা ভাবতে লাগল, প্রতিদিনই মুসলিম শিবিরে না জানি কতশত নতুন সেনা যোগ দিচ্ছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও এর ইম্প্যাক্ট অনেক বড়, কেননা বাইজান্টাইন ভাবনা তাদেরকেই ক্রমশ ফ্রাস্ট্রেটেড করে তুলছিল। এই জাতীয় ট্রিককেই বলে ডিসেপসন। আর সানজু বলেন, *"সব যুদ্ধই ডিসেপসন নির্ভর।"*

তাই যখন আপনি শত্রুকে হারিয়ে দিতে প্রস্তুত, ভান করুন যেন যুদ্ধ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন। তেমনি এমন কিছু করুন যেন শত্রু তটস্থ থাকে এই ভেবে যে আপনি বোধহয় আশেপাশেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছেন, অথচ বাস্তবে আপনি তখনো বেশ

দুরেই আছেন; আর যখন শত্রুর ওপর হামলে পরবেন তার আগমুহুর্ত পর্যন্ত যেন শত্রু টের না পায় যে আপনি এতটা কাছে চলে এসেছেন। অথবা শত্রুকে প্রলুব্ধ করুন আপনার ফাঁদে পা দিতে, তারপর ধ্বংস করুন।

শত্রু যখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনিও প্রস্তুত হন। শত্রুর শক্তি অথবা বিশেষ সামর্থ্যকে চিহ্নিত করুন এবং পারতপক্ষে তার স্ট্রেন্থ'কে এড়িয়ে চলুন। তার জেনারেলদের রাগিয়ে দিন আর বিভ্রান্ত রাখুন। ইরিটেডেড আর কনফিউজড মানুষ ভুল করে বেশি।

কিছু রাজা-বাদশা-প্রসিডেন্ট আছেন যারা গায়ে পরে আশেপাশের শান্তিপ্রিয় দেশের সাথে লাগার ধান্দায় থাকেন। ইস্টার্ন হু এর রাজা ছিলেন তেমনই একজন। তো তিনি একদিন প্রতিবেশি দেশ শিংনু এর রাজা মোতুং এর কাছে এক হাজার অশ্ব দাবি করে বসলেন। দাবি শুনে মোতুং এর সভাসদেরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালো। কিন্তু রাজা মোতুং বললেন ঘোড়ার চেয়ে প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক বেশি জরুরী। তাই পাঠানো হল এক হাজার ঘোড়া।

কিছুদিন পর ইস্টার্ন হু এর রাজা ফের আব্দার করল। এইবার তার একজন রাজকুমারী চাই। সভাসদেরা রাগে ফেটে পড়ল, যুদ্ধ ছাড়া কোন ছাড় নাই এইবার। কিন্তু রাজা মোতুং বললেন এক রাজকুমারীর চেয়ে প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক বেশি জরুরী। তাই ঘটা করে এক রাজকুমারীর বিয়ে দেয়া হল।

কিছুদিন পর ফের আরেক বায়না। এইবার এক হাজার লি জমি দিতে হবে। রাজা মতুং সভাসদদের মতামত চাইলেন। সভাসদদের কেউ বলল 'কক্ষনো না' আবার কেউ বলল 'কিছু জমির চেয়ে প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক বেশি জরুরী।' আর যায় কই, রাজা মোতুং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "মাটি হল রাষ্ট্রের ভিত্তি, এক কনা মাটি ছাড়ার কথাও যে ভেবেছে, তাদের সব কয়টার কল্লা কাটো। আর এক্ষুনি প্রস্তুত হও ইস্টার্ন হু আক্রমণের জন্য। আমি রওনা দেবার পর যারেই আমার পেছনে পাওয়া যাবে, তাদেরও কল্লা যাবে।" ইস্টার্ন হু এই রিএকশনের জন্য রেডি ছিল না। ফলে রাজা মতুং সহজেই তাদের পরাস্ত করেছিল। আর সানজু বললেন, *"মোক্ষম সময়ের আগ পর্যন্ত দুর্বল সাজার ভান কর আর প্রতিপক্ষকে উস্কে দিতে থাক!"*

৫

শত্রুকে ক্রমাগত চাপের মুখে রাখতে হয়, সে যখন দু'দন্ড শান্তি খোঁজে, তখনই তাকে জ্বালাতে হবে। যখন সে এক থাকার চেষ্টা করবে, আপনি তখন ফন্দি খুঁজবেন কিভাবে তাকে ডিভাইড করা যায়। এক্ষেত্রে শত্রুর নিজেদের ভেতর কোন্দল লাগায়া দেন, তার মিত্রদের সাথে প্যাচ লাগান, মোটকথা তারে দৌড়ের উপর রাখেন।

গালফ ওয়ারে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের পর কুয়েতের মাটিতে খুব শক্তিশালী ডিফেন্স নিয়েছিল। শোয়ার্জকফের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীও সেই ডিফেন্স বরাবর সৌদি আরবের

মাটিতে অবস্থান নিল। তারপর এমন একটা অবস্থা তৈরি করল যে সাদ্দাম বিশ্বাস করল যে এটাক যদি হয়, তাহলে তা হবে পার্সিয়ান গালফ দিয়ে। তাই সে অই এম্ফিবিয়াস এসল্ট থামাইতে আরো এফোর্ট দিল। কিন্তু ধুর্ত শোয়ার্জকফ কিন্তু সম্পূর্ণ উলটা দিক দিয়ে, কুয়েত থেকেও অনেক পশ্চিমে ইরাকের ভেতর দিয়ে ঢুকে আক্রমণ করে সাদ্দামকে চমকে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে রিপাবলিকান গার্ডসহ সাদ্দাম হোসেন ১০০ ঘন্টার ভেতর পরাস্ত হন। এই ব্যাপারে সানজু আগেই বলেছিলেন, *"শত্রু প্রস্তুত হবার আগেই আক্রমণ করো; আর আক্রমণ করো সেই দিক দিয়ে, যেদিক দিয়ে শত্রু কষ্মিনকালেও আক্রান্ত হবে বলে ভাবেনি।"*

এসবই একজন স্ট্রেটেজিস্টের যুদ্ধ জয়ের চাবিকাঠি। যদিও যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে বদলে যাওয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন কর্মপন্থা ঠিক করতে হয়। তারপরও যুদ্ধ শুরুর আগেই পরিকল্পিত হিসেব নিকেশ আপনাকে বাতলে দেবে যুদ্ধ জেতার সম্ভাবনা কতখানি। সানজু বলেন, *"যে যত বেশি হিসেব কষে পরিকল্পনা করে সে তত বেশি যুদ্ধ জেতে।"*

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29969648

দ্বিতীয় অধ্যায়: ওয়েজিং ওয়ার

"There has never been a protraceted whar from which a country has benefited."

মুবারিজুনরা ছিলেন চ্যাম্পিয়ন মল্লযোদ্ধা, তারা খোলাফায়ে রাশেদিনের হয়ে লড়তেন। সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হত ডুয়েল বা দ্বন্দযুদ্ধ দিয়ে। এইসব ডুয়েলের ফলাফল সাধারণ সেনাদের মনোবলে দারুন প্রভাব ফেলত। তাই মুবারিজুনদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এইরকম আরেকটা এলিট ফোর্স ছিল মধ্যযুগের ইউরোপিয়ান নাইটরা। এখনকার দিনের কমান্ডোরাও অনেকটা একই রোল প্লে করে থাকেন।

ট্রোজান ওয়ার হিরো একিলিসও ছিলেন একজন এলিট যোদ্ধা। ট্রয়ের রাজপুত্র হেক্টরকে দ্বন্দযুদ্ধে হারানো একিলিস ছিলেন একজন চরম স্কিল্ড ইনফেন্ট্রিমেন। ট্রোজান ওয়ারে তিনি গ্রীক সেনাপতি আগামেননের হয়ে ট্রোজানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সানজুর পাঠক হিসেবে আপনি আর্ট অব ওয়ারে একিলিসের স্কিল অনুসন্ধান করলে হতাশ হবেন। সানজুর আর্ট অব ওয়ার বস্তুত আগামেননদের জন্য লেখা।

সুতরাং ধরে নিচ্ছি আপনি একটা যুদ্ধ বাধাবেনই। এই যুদ্ধ বাধানোর ব্যাপার স্যাপার নিয়াই সানজুর তের অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, নাম 'ওয়েজিং ওয়ার'। কথায় আছে, এমেচারেরা ভাবে যুদ্ধের ট্যাকটিক্স নিয়া, আর প্রফেশনালেরা ভাবে যুদ্ধের লজিস্টিক নিয়া। কারণ একটা যুদ্ধ চালানো বেশ

খরচের ব্যাপার। আসেন সানজুর জবানিতে খ্রীস্টের জন্মের ৫০০ আগের সময়কার যুদ্ধের খরচের বৃত্তান্তটা শুনি।

১

গড়পরতায় একেকটা সামরিক অভিযানে চার ঘোড়ায় টানা চ্যারিয়ট লাগে ১০০০টা, আরো ১০০০টা লাগে চার ঘোড়ায় টানা মালবাহী ওয়াগন; আর লাগে এক লাখ বর্মসহ যোদ্ধা। এমন একটা বাহিনী নিয়ে ১০০০ লি দূরে গিয়ে যুদ্ধ করতে আনুসাঙ্গিক খরচসহ প্রত্যেকদিনের জন্য গুনতে হয় ১০০০ স্বর্নমুদ্রা। তাহলেই ভাবেন আধুনিক একেকটা কেম্পেইনের খরচ কী হতে পারে! এইবার হিসেব করেন আপনার ট্রেজারি কী পরিমান এফোর্ড করতে পারবে। ফাইনালি আপনিই ডিসাইড করেন যুদ্ধে যাবেন কিনা, গেলে কয়টা ডিভিশন নিয়া কত দিনের জন্য যাবেন।

২

মানুষ জেতার জন্যই যুদ্ধ করে। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হতে থাকে সৈনিকের অস্ত্রের ধার আর মনোবল ততই কমতে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে রাষ্ট্রের সম্পদ চরম ভাবে বিনষ্ট হয়। সম্পদের ঘাটতি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয় আর এই অবস্থায় স্বভাবতই আপনার প্রতিবেশীরা সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। তখন যত ভাল উপদেষ্টা আর সভাসদই আপনার থাকুক না কেন, কার্যকর কোন পরিকল্পনাই আর আপনার পক্ষে করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানদের যুদ্ধ, গালফ ওয়ার অথবা দুইটা বিশ্বযুদ্ধই দেখুন, কোন পক্ষই কিন্তু এসব দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে তেমন লাভবান হতে পারেনি। তাই আক্রমণ যখন করবেন তখন শত্রুর চোখের পলক পড়ার আগেই সর্বশক্তিতে আক্রমণ করুন আর, যুদ্ধ যত সংক্ষিপ্ত করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ শেষে কোন দেশ লাভবান হয়েছে, এমন উদাহরণ ইতিহাসে নেই!

যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে যদি আপনি ওয়াকিবহাল না থাকেন তাহলে যুদ্ধ করে লাভবান হবার কৌশল আপনি কখনই রপ্ত করতে পারবেন না। একজন কৌশলী সমরবিদের একই যুদ্ধ চলাকালে দ্বিতীয়বার নতুন করে সৈন্য সংগ্রহের দরকার পরে না, আর রসদও সরবরাহ করতে হয় সাকুল্যে দুইবার; একবার সেনাদল যুদ্ধে যাবার সময়, আরেকবার যুদ্ধে জিতে ফেরার পথে, মাঝের সময়টা তার আর্মি শত্রুর দখল করা রসদ দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়। অবশ্য ভিনদেশে দীর্ঘদিন যুদ্ধরত আর্মির রসদ যোগাতে যে কোন রাষ্ট্রকেই ভুগতে হয়, আর ভুগতে হয় সেই রাষ্ট্রের জনগনকেও।

যুদ্ধ লাগলে দেশে দ্রব্যমুল্য বাড়বেই, এর প্রভাব দেশের জনগনের ওপরও পরবে। ফলে দেশের সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পাবে আর দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দশ ভাগের তিন ভাগ কমে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত যুদ্ধ সরঞ্জামাদি মেরামত আর রসদ যোগাতে সরকারি রাজস্বের দশ ভাগের চার ভাগ খরচ হয়ে যাবে। তাই আপনি যদি বিচক্ষণ জেনারেল হন, আপনি চাইবেন

শত্রুর রসদ ছিনিয়ে নিয়ে চলতে। কারণ এই প্রেক্ষাপটে শত্রুর এক দফা রসদ আপনার নিজের ২০ দফা রসদের সমান।

প্রাচীনকালে রাজারা যে কোন দেশ দখলের পর গনিমতের মালামাল সৈন্যদের মাঝেই ভাগ করে দিতেন, কারণ একটা যুদ্ধ শেষে আপনার সৈন্যদের কিছু ইন্সট্যান্ট প্রাপ্তি থাকা উচিত। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের জন্য শত্রু সেনাদের তো আগে নিধন করতে হবে, আর সেটা সম্ভব যদি আপনি আপনার সৈন্যরদের ঠিকমত তাতায়ে দিতে পারেন।

হান'দের রাজত্বকালে কুয়েই চউ প্রদেশের পু ইয়াং আর পান হাং বিদ্রোহীদের দমন করতে চিন চউ এর রাজা তু শিয়াং অভিযান চালালেন। প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীরা পিছু হটল আর তু শিয়াং এর আর্মি গনিমতের মাল লুটে আরাম আয়েশে মত্ত হয়ে উঠল। অথচ বিদ্রোহীরা তখনও বেশ শক্তিশালী আর তারা পাল্টা আক্রমণের পায়তারা করছিল। তু শিয়াং দেখল আরাম আয়েশে মত্ত তার এই সেনাবাহিনী যুদ্ধের কোন মুডেই নেই। তাই তাদের ওয়ার ফুটিং এ ফিরিয়ে আনতে তিনি এক ফন্দি করলেন; তিনি তার সৈন্যদের জন্য একটা শিকারের প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন।

পরদিন সবাই শিকার করতে বেরিয়ে যেতেই তু শিয়াং তাদের সব ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। শিকার শেষে ফিরে এসে সৈন্যরা জানল যে দুষ্ট বিদ্রোহীরা সুযোগ পেয়ে তাদের সব আরাম হারাম করে দিয়ে গেছে। সৈন্যরা সবাই তখন রোষের আগুনে জ্বলছে আর এই সুযোগে তু শিয়াং

তাদের এই বলে উস্কে দিল যে, তারা যদি তাদের সেরাটা উজাড় করে লড়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে এই বিদ্রোহীদের পুরোপুরি নিকেশ করে পুড়ে যাওয়া সম্পদের ১০ গুন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সৈন্যদের মাঝে জেদ আর প্রতিহিংসা তখন তুঙ্গে, আর তু শিইয়াং পরদিন সকালেই ক্রোধান্ধ এই সেনাদের নিয়ে স্পিরিটেড এক আক্রমণে বিদ্রোহীদের নির্মূল করলেন।

তাই সানজু বলেন, *"সৈন্যরা প্রতিপক্ষের সেনাদের মারে, কারণ তারা হত্যার জন্য তাতিয়ে থাকে। আর তারা পরাজিত শত্রুর মাল লুটে নেয়, কারণ তারা ভাবে এটা তাদের প্রাণপন যুদ্ধের তাৎক্ষণিক পুরস্কার। তাই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ১০টা চ্যারিয়ট আটক করতে পারবে, প্রথম চ্যারিয়টটা যারা দখল করল, তাদের পুরস্কৃত কর। শত্রুর পতাকা নামিয়ে নিজের পতাকা চড়াও, নিজের চ্যারিয়টের সাথে শত্রুর চ্যারিয়টও যুদ্ধে কাজে লাগাও। কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভাল আচরণ কর, যেন তাদেরও কাজে লাগানো যায়। এভাবেই যুদ্ধে জিতে আরো শক্তিশালী হওয়া যায়। যুদ্ধে জিততে পারাটাই মুখ্য, তাই বুদ্ধিমান কমান্ডারেরা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সবসময় সযত্নে এড়িয়ে চলে। এজন্যই যুদ্ধের সেনাপতিদের বলে জনতার ভাগ্যবিধাতা, তার উপরই জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে।"*

তৃতীয় অধ্যায়: কিভাবে আক্রমণ করবেন?

"The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting."

১৯৩৮ সালে চেকস্লাভিয়ার জার্মান সীমান্তবর্তী সুদেতানল্যান্ডের জনতার জন্য এডলফ হিটলারের দরদ উথলে উঠল। তার কয়েকদিন আগেই চাপাবাজি আর ভোটাভুটি করে গায়ের জোরে তিনি অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছেন। এইবার তার দাবী, সুদেতানল্যান্ডের জনতা মানসে সাচ্চা জার্মান, আর তারাও অস্ট্রিয়ানদের মতই পিতৃরাষ্ট্র জার্মানীর কোলে ফিরে আসতে উন্মুখ। ঐ বর্বর চেকস্লাভিয়ান সরকার এদের মাইরাই ফেলবে, তাই নিতান্তই মহান জার্মান জাতির স্বার্থে সুদেতানল্যান্ড তার চাইই চাই। চেকস্লাভিয়ার ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী, কিন্তু তার ইউরোপিয়ান মিত্র ফ্রান্স-বৃটেন সবাই তখন আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ এড়াবার পথ খুজতে আতঙ্কে আছে। তাই ঐ বছরেরই ৩০ সেপ্টেম্বরের এক শান্ত স্নিগ্ধ সকালে জার্মানীর মিউনিখ শহরের গোলটেবিলে চেকস্লাভদের উপস্থিতি ছাড়াই ফ্রান্স-বৃটেন মিলে অনাড়ম্বরভাবেই চেকস্লাভিয়াকে হিটলারের হাতে তুলে দিল। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, যুদ্ধ মানেই মৃত্যু।

জাজেস টু নোট: যুদ্ধ-রক্তপাত ছাড়া জার্মানীর চেকস্লোভাকিয়া জয় এবং ইংগ-ফরাসী এলায়েন্সের ভূমিকা!

১

মহামতি সানজু বলেন, *যুদ্ধের সেরা পলিসি হল, কোন প্রকার কায়িক ক্ষতি ছাড়াই শত্রুর দেশ দখল করে ফেলা। শত্রুর আর্মিকে ধ্বংস করার চেয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারাটা শ্রেয়। একশ যুদ্ধে জেতা মানেই যুদ্ধে পারদর্শীতার উৎকর্ষ নয়, পারদর্শীতার উৎকর্ষ হল যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও শত্রুকে পরাজত করতে পারা।*

তাই সেনাপতি হিসেবে আপনার সেরা স্ট্রেটেজি হবে শত্রুর পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেবার চেষ্টা করা। তা না পারলে অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সাথে আপনার শত্রুর সম্পর্কটা যেন নড়বড়ে করে দেয়া যায় সেই চেষ্টা করা। যদি তাও না পারেন, তবে অন্তত চেষ্টা করুন দেয়ালঘেরা শহরে অবস্থান নেয়া শত্রুর সাথে লড়াই এড়িয়ে যেতে। কারণ দেয়ালঘেরা শহর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগবে তিনমাস, আর দেয়ালভেঙ্গে শত্রুর কাছে যেতে আরও তিনমাস লেগে যাবে। আর অধৈর্য হয়ে যদি প্রস্তুতি ছাড়াই আপনি আক্রমণ করে বসেন, তো আপনার তিন ভাগের একভাগ ফোর্স মারা পড়বে শহর দখলের আগেই। আপনি যদি দক্ষ সেনাপতি হন তাহলে চেষ্টা করবেন নিজ সৈন্য হতাহত না করেই যুদ্ধে জিততে। আর একেই বলে কৌশলী আক্রমণ বা এটাক বাই স্ট্রেটেজেম।

২

ক্লসউইতজ ছিলেন প্রুশিয়ান জেনারেল আর বিখ্যাত মিলিটারী থিওরিস্ট। তিনি বলেন শত্রুর তিনগুন সেনা সাথে না থাকলে

আক্রমণে গিয়া লাভ নাই, আপনি হারবেন। তেমনি সানজু বলেন, যদি আপনার হাতে শত্রুর দশগুন বেশি সেনা থাকে, তাহলে শত্রুকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারেন। যদি আপনার আর শত্রুর রেশিও হয় ৫:১, আক্রমণ করেন; যদি হয় ২:১, তাহলে শত্রুকে ভাগ করে নিয়ে তারপর আক্রমণ করুন। যদি সমানে সমান হন, বুঝেশুনে লাগতে যান, হারজিতের সম্ভাবনা কিন্তু ৫০:৫০।

যদি আপনি শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় দুর্বল হন, তাহলে পিছুহটার রাস্তা চিনে রাখুন। অবশ্য যদি দেখেন আপনার শত্রু বিভিন্ন কারণে এলোমেলো অবস্থায় আছে, তাহলে সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা নিয়েও আপনি যুদ্ধ করে জিততে পারবেন। কিন্তু মনে রাখার বিষয় হল, শেষ পর্যন্ত কিন্তু যার আর্মড ফোর্সেস এর সাইজ বড়, সেই জেতে। স্পার্টানরা থার্মোপেলির যুদ্ধে ৩০০ জন মিলে ঐতিহাসিক যুদ্ধ লড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু পার্সিয়ানদের ঠেকাতে পারেনি।

৩

যুদ্ধে উভয় পক্ষেই কিন্তু ট্রেইনড সৈন্য আর অফিসার থাকে। তারপরও কেউ হারে, কেউ জেতে। উপযুক্ত সেনাপতির নিয়োগের মাধ্যমে এই পার্থক্যটা গড়ে দেয় রাষ্ট্রপ্রধান। যুদ্ধে সেনাপতিরা রাষ্ট্রের রক্ষক। দক্ষ আর বিচক্ষণ সেনাপতির হাতে রাষ্ট্র সুরক্ষিত, আর অদক্ষ সেনাপতির কারণে রাষ্ট্র পর্যুদস্ত হয়।

তিনভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান তার আর্মির জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনেন।

এক. আর্মি নিয়া হব্লিং করা বা ল্যাংচানো। মানে হল, আর্মি রেডি আছে কিনা তা না জেনেই যুদ্ধে পাঠানো। এই রেডিনেস মানে ট্রেনিং রেডিনেস, লজিস্টিক রেডিনেস, এমন কি যেখানে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে সে টেরেইনে আর আবহাওয়ায় যুদ্ধের জন্য রেডিনেস, সবই। ১৮১২ র পেট্রিয়াটিক ওয়ারে নেপোলিয়নের গ্রান্ড আর্মি যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই রাশিয়ার মাটিতে রাশিয়ানদের হারানোর চেষ্টা করল এবং হারল। পক্ষান্তরে কুয়েত থেকে সাদ্দামের ইরাকি সেনাবাহিনীকে হঠাতে, ২০০৬ এর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত টানা লজিস্টিক প্রিপারেশন নেয় যুক্তরাষ্ট্র, এই অপারেশনের নাম অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড। ফলাফল শোওার্জকফের গ্রাউন্ড এটাক শুরুর ১০০ ঘন্টার ভেতর ইরাকিদের পরাজয়।

দুই. সিভিল প্রশাসন চালানোর মত করে আর্মি চালানোর অপচেষ্টা। বেশ্যাবৃত্তিকে যদি পেশা বলে মেনে নিতে আপনার কোন সংকোচ না থাকে, তবে জানবেন যে সামরিক পেশা পৃথিবীর অন্যতম ৩য় প্রাচীন পেশা (প্রথমটা হল কৃষিকাজ)। তাই ঐতিহ্যগতভাবেই সেনাবাহিনী পরিচালিত হয় নিজস্ব কোড দ্বারা, যা অন্যান্য রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার চেয়ে ভিন্নতর। চানক্যের মত প্রতিথযশা অর্থশাস্ত্রবিদের রননীতি শুনলে কিন্তু চমকে উঠবেন, তার মতে শত্রুকে ভ্রুনাবস্থায়ই বধ করতে পারাতেই সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব!

তিন. অনুপযুক্ত অফিসারদের দ্বারা সেনাবাহিনী পরিচালনার চেষ্টা করা। যুদ্ধে প্রত্যেক স্তরের সেনা কমান্ডারদের মটিভেশন

আর ডেডিকেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যক্ষেত্রে যতই চৌকাষ হোন না কেন, যথাযথ রেজিমেন্টেশন ছাড়া কেউই যুদ্ধক্ষত্রে সৈন্য পরিচালনার পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন না, আর এই রেজিমেন্টেশন গড়ে ওঠে দিনের পর দিন সৈন্যদের সাথে নিবির সহচর্যে। তাই কমান্ডার নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেই হবে। অন্যথায় সেনাবাহিনীতে দেখা দেবে বিশৃংখলা আর প্রতিবেশিরা সে সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।

৪

যুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে পূর্বানুমানের কোন সুযোগ কি আছে? সানজু কিন্তু বলেন, আছে। তার মতে পাঁচটি ক্ষেত্রে এমন ভবিষ্যৎবানী করা যায়-

এক. সেই জিতবে যে জানে কখন লড়তে হবে আর কখন লড়াই এড়াতে হবে।
দুই. যিনি বড় এবং ছোট উভয় ধরনের সৈন্যদল পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত।
তিন. যার সেনাদলের সবাই একই স্পিরিটে একতাবদ্ধ।
চার. যিনি সদা নিজ আর্মিকে প্রস্তুত রাখেন আর শত্রু কখন বেখেয়াল হবে সেই প্রতীক্ষায় থাকেন।
পাঁচ. যার জেনারেলরা যোগ্যতর আর যিনি তার জেনারেলদের সৈন্য পরিচালনায় অযথা হস্তক্ষেপ করেন না।

আপনি যদি আপনার নিজের আর আপনার শত্রুর, উভয়ের সামর্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন, ১০০ যুদ্ধেও আপনার হেরে বসার ভয় নেই। যদি আপনি নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল হন কিন্তু শত্রু সম্পর্কে সম্যক অবগত নাও হন; আপনার হারজিতের অনুপাত হবে ৫০:৫০। মানে কিছু যুদ্ধে আপনি জিতবেন আবার কিছু যুদ্ধে হারবেন। আর যদি আপনি আপনার নিজের আর আপনার শত্রুর, কারো সম্পর্কেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না থাকেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আসছে প্রত্যেকটা যুদ্ধে আপনি শোচনীয়ভাবে হারবেন।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29970511

চতুর্থ অধ্যায়: রণকৌশলগত বিন্যাস

Invincibility lies in the defecne; the possiblity of victory in the attack.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান এটাককে বলা হতো 'ব্লিতজক্রিগ'। ঐটা ছিল জার্মানদের ট্রাম্পকার্ড। ব্যাপারটা হলো, শুরুতেই প্রতিপক্ষের সারা ডিফেন্স জুড়ে হামলে পরে একটা ফাটল খুঁজে বের করা। এরপর ডিফেন্সের ঐ ফাটলটা দিয়ে সর্বশক্তিতে দ্রুত প্রতিপক্ষের যতটা সম্ভব গভীরে পৌছে যাওয়া, যেন ডিফেন্সটা দুই ভাগ হয়ে ইমব্যালান্স হয়ে পরে। ফলাফল হল প্রতিপক্ষ আয়েশ করে যুদ্ধ শুরু করার আগেই দেখে বেইল নাই।

তো এই জার্মানরাই যখন আবার রাশানদের হাতে মস্কোর আশেপাশে নাস্তানাবুদ হতে লাগল, তখন তারা হেজহজ ডিফেন্স নিল। মানে ছোট ছোট পকেট অফ রেজিস্টেন্স যেখানে জার্মানরা ট্রেঞ্চ গেড়ে বসে থাকত আর আকাশপথে তাদের রসদ সরবরাহ করা হত। এইসবগুলো পকেট ক্লিয়ার করে করে এগুনো রাশানদের জন্য ছিল বিশাল এক হ্যাপা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানদের কিন্তু হারতেই হল।

১

আদিকালের ঝানু যোদ্ধারা প্রথমে নিজেদের সুরক্ষিত করে নিয়ে তারপর শত্রুর দুর্বলতার জন্য অপেক্ষায় থাকত। নিজেদের সুরক্ষিত করাটা সহজ, কিন্তু শত্রু কখন সুযোগ দেবে

সেটা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আপনি শত্রুকে যত বেশি জানবেন, ততই তার দুর্বলতাগুলো আপনার চোখে পরবে। আর এই দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগানোর সামর্থ্য আপনি যত বাড়াবেন ততই আপনার জেতার সুযোগ বেড়ে যাবে। এখন সুযোগ আপনি কবে কখন কিভাবে কাজে লাগাবেন, অথবা আদৌ লাগাবেন কিনা, সেইটা সম্পূর্ণই আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

২

কথিত আছে লখিন্দরকে সুরক্ষিত রাখতে নাকি লোহার ঘর বানানো হয়েছিল, তারপরও বেহুলাকে কিন্তু সাপে কাটা স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভাসতে হয়েছিল। প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স অবশ্যই জরুরী এবং সুচিন্তিত প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা আপনাকে প্রায় অপরাজেয় করে দিতে পারে। কুয়েত জবরদখলের পর সাদ্দাম যেমন সারা কুয়েত জুড়ে নজিরবিহীন ডিফেন্স নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীও কুয়েত ঘিরে বসেছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু এই অচলাবস্থা কদ্দিন?

সব দুর্গেই কোন না কোন ফাটল থাকে, আর অদম্য সেনাপতিরা ঠিকই কোন না কোন উপায় বের করে নেয়। পাঁচ মাসব্যাপি লজিস্টিক বিল্ড আপ আর এয়ার অপারেশন শেষে যৌথবাহিনী সেই কাঙ্ক্ষিত ফাটল খুজে পেয়ে ঠিকই সাদ্দাম বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। তাই প্রতিরক্ষা আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারে, কিন্তু জয়ের জন্য আক্রমণের কোনই বিকল্প নেই।

যুদ্ধে যার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম সে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে, আর যার বেশি সে আক্রমণের পায়তারা কষে। বিচক্ষণ সেনাপতি যখন ডিফেন্স নেয় তখন সে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজায় যে আক্রমণকারী কোন পথে কোথায় আক্রমণ করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। আর যখন সে আক্রমণে যায় তখন এমন এমন অপ্রত্যশিত স্থান থেকে উড়ে এসে আঘাত করে, যে ডিফেন্সে থাকা শত্রু ঠাহরই করতে পারে না যে কোন দিক রেখে কোন দিক সামলাবে। আর যারা প্রতিরক্ষা আর আক্রমণে সমান সিদ্ধহস্ত, সার্বিকভাবে তারাই বিজয়ী হয়।

৩

বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে বিজয় চিনতে পারায় কোন বাহাদুরি নেই, এমনকি একটা যুদ্ধে আপনি জিতে এলেন আর সবাই বলল, সাবাশ, একেও যুদ্ধে পারদর্শীতার উৎকর্ষ বলে না। মরা একটা খরগোশকে যে কেউ তুলতে পারে, সূর্য আর চাঁদ চিনতে পারাকে কেউ চোখের পরীক্ষা বলে না, আর বজ্রের শব্দ যে শুনতে পায় তাকে কেউ খুব কানখাড়া বলে বাহবা দেয় না। আগেকার দিনে চৌকষ যোদ্ধা তাদেরই বলা হত যারা শুধু জিততই না বরং খুব সচ্ছন্দ্যেই জিতত। কিন্তু সহজ বিজয়ে না আছে বিচক্ষণতার খ্যাতি, না আছে সাহসের কৃতিত্ব।

বরং একজন প্রকৃত যোদ্ধা নির্ভুল ভাবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমন বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে যেখানে যুদ্ধক্ষত্রে পা দেবার আগেই, পরিকল্পনার টেবিলেই সে শত্রুকে

পরাজিত করে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল স্লীমের ১৪তম আর্মি বার্মা থিয়েটারে জাপানিদের হাতে এয়সা মার খেল যে তার আর্মির নাম হয়ে গেল 'ফরগোটেন আর্মি' আর জাপানিরা হয়ে গেল 'ইনভিনসিবল জ্যাপস'। পিছুহটে ভারত এসে স্লীম বুঝল যে সদ্য মধ্যপ্রাচ্যের মরুভুমিতে যুদ্ধকরে ফেরত তার ডিভিশন গুলো বার্মার জঙ্গলে লড়বার মত স্কিলড ছিলনা। তাই তিনি জঙ্গল যুদ্ধের উপর তার আর্মিকে দক্ষ করতে ম্যাসিভ ট্রেনিঙ্গের ব্যবস্থা করলেন। এরপর যখন তিনি বার্মা থিয়েটারে তার আর্মি নিয়ে পা রাখলেন, তখন সবকটা জাপানিকে ঝেটিয়ে বিদায় করে তবে থামলেন।

বিচক্ষণ সেনাপতিরা এমন অবস্থান থেকে যুদ্ধে নামেন যে যেখান থেকে তাকে আর পরাজিত করা অসম্ভব, এবং তারা যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার ন্যুনতম সুযোগটাও নিতে কখনো পিছপা হননা। মাজিনো লাইন নামের প্রতিরক্ষা দেয়ালের ওপাশে বসে ফরাসীরা ভেবেছিল জার্মানদের কি সাধ্যি এই মেজিনো লাইন পেড়িয়ে এসে তাদের আক্রমণ করে। সেই অপরাজেয় মেজিনো লাইনের একটা গ্যাপে ছিল আর্ডেন ফরেস্ট। কেউ কস্মিকালেও ভাবেনি কোন সেনাবাহিনী এই ঘন বনের ভেতর দিয়ে মার্চ করতে পারে। জার্মানরা পুরা মেজিনো লাইন অটুট রেখে সেই আর্ডেন ফরেস্ট দিয়েই ঢুকে ইংগ-ফরাসী দের এমন ধাওয়া দিল যে ডানকির্কের উপকুলে অপারেশন ডাইনামো নামে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত পিছুহটার দৃষ্টান্ত রচিত হল।

সফল সেনানায়কেরা তাদের সেনাবাহিনীতে ন্যায়বিচার আর শৃংখলার চর্চা করে সাফল্যকে নিয়ন্ত্রন করেন। আলেকজান্ডার থেকে চেঙ্গিস থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ, এরা কেউই নিজ সেনাদলের শৃংখলার সাথে কখনই আপোষ করেননি। এজন্যই বলে, বিচক্ষণ সেনাপতি যুদ্ধক্ষত্রে জয়ের সব রাস্তা ভেবেই তারপর যুদ্ধক্ষত্রে পা দেন। আর যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তারপর জেতার রাস্তা খোঁজেন, তিনিই শোচনীয়ভাবে হারেন।

৫

পাঁচটি দৃস্টিকোন থেকে যে কোন পরিস্থিতিকে যুদ্ধের জন্য যাচাই করতে হয়। প্রথমেই যুদ্ধক্ষেত্রের দুরত্ব অনুধাবন করুন। এবার হিসেব করুন এই দুরত্ব পেরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে কি পরিমান রসদ চাই। এরপর শত্রুর সংখ্যার বিপরীতে আপনার কি পরিমান সেনা আর সরঞ্জামাদি দরকার সে হিসেব করুন। সর্বোপরি শত্রু আর আপনার তুলনামুলক বিচারে নির্ধারন করার চেষ্টা করুন এই যুদ্ধে আপনার জেতার সম্ভাবনা কতখানি। যদি শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হন, তবে আপনার সেনাবাহিনী প্রবল জলস্রোতের মত প্রতিপক্ষের সব প্রতিরোধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29970596

পঞ্চম অধ্যায়: কমান্ডার হিসেবে আপনি কতটা শক্তিশালী?

In battle, there are not more than two methods of attack- the direct and the indirect; yet these tow in combination give rise to an endless series of manewvers.

১

ধরেন আপনি একটা অফিসের বস আর আপনার অধীনে দশজন কর্মী কাজ করেন। এদের বেতন ভাতা, ট্রেনিং, পারফরমেন্স, পোস্টিং, প্রমোশন, ছুটি আর ওয়েলফেয়ার দেখার দায়িত্ব আপনার। তো আশা করছি আপনিই ভাল বুঝেন কিভাবে তাদের দিয়ে অফিসের কাজ চালিয়ে নিতে হয়। আর আপনি যদি দশজনের একটা অফিস চালাতে পারেন তো ১০০ জনের একটা প্রতিষ্ঠানও পারবেন। এইটা আমার না, মহামতি সানজুর দাবী। সানজু বলেন, *ব্যবস্থাপনা আর নিয়ন্ত্রণের (ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল) বিষয়ে একজন সামলাইতে যে ফরমুলা একশজন সামলাইতেও ঐ একই ফরমুলা। সংগঠনের সাইজ অনুযায়ী চেইন অব কমান্ডটা খালি লম্বা হয়, এই আরকি।*

আগেকার দিনে সারা যুদ্ধক্ষত্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের পরিচালনার জন্য ঢাক, শিঙ্গা, পতাকা ঝান্ডা ব্যবহার করা হত, এখনও নেভাল শীপে পতাকা ব্যবহার হয়। এর

কারণ একজন কমান্ডারের পক্ষে প্রত্যেক সৈনিকের কানের কাছে গিয়ে কমান্ড দেয়া সম্ভব না। তাই ঢাক, শিঙ্গা, পতাকা ঝান্ডার সংকেতে সৈন্যরা চলে, থামে, আগায় আবার পিছায়। আধুনিক কালে এই ঢাক, শিঙ্গা, পতাকা ঝান্ডার বদলে আসছে ওয়্যারলেস রেডিও, স্যাটফোন ইত্যাদি, কিন্তু উপযোগিতাটা একই। এই কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসীরা কখনো একা এগিয়ে যায় না, আবার কাপুরুষরাও কখনো একা পালাতে পারে না! তাই ফরমেশন আর কমুনিকেশন ঠিক থাকলে একটা স্কোয়াড কমান্ড করতে যে বেসিক স্কিল দরকার, একটা আর্মি চালাইতেও মোটামুটি একই স্কিল দরকার।

২

ধরেন আপনার শত্রু উত্তর দিকে মুখ করে ডিফেন্স নিয়া আপনারে মোকাবেলা করার জন্য ওঁত পেতে আছে। আপনি আপনার আর্মি নিয়া সামনা সামনি তাকে এটাক করলেন, একে বলে চেং বা ডাইরেক্ট অথবা সাধারণ মেনুভার। আর আপনি যদি তারে সামনে দিয়া এটাক না করে তার ডান অথবা বাম পাশ দিয়ে করেন, তাকে বলে চি' বা ইনডাইরেক্ট অথবা অসাধারণ মেনুভার। সানজুর কেরামতি হল তিনি সব যুদ্ধে এই মেনুভারের ওপর দারুন গুরুত্ব দিছেন। তিনি গায়ের জোরে অথবা সৈন্য সংখ্যার চেয়ে কমান্ডারদের মেনুভার করার সামর্থ্যকে বেশি প্রাধান্য দিছেন, এই মেনুভারিস্ট এপ্রোচের জন্য তিনি অনন্য।

যুদ্ধে শত্রুকে সামনে থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা চরম বলদামি বিশেষ। কারণ এই পথে আপনি আসবেন ভেবেই সে তার সব প্ল্যান আর ফাঁদ সাজাইছে। আর সেই ফাঁদে আপনি সেধে পা দেয়াটা সুইসাইডাল। সাধারণত যুদ্ধে সামনে থেকে শত্রুকে এনগেজ করে রেখে তার কোন একটা ফ্ল্যাঙ্ক থেকে আক্রমণ করা হয়। তাই সানজু বলেন, *যুদ্ধে ডাইরেক্ট মেনুভারটা করা হয় শত্রুকে এনগেজ করতে আর ইনডাইরেক্ট মেনুভার করা হয় জিততে।*

সানজুর মতে, *বিচক্ষণ সেনাপতির মাথায় এই ইনডাইরেক্ট মেনুভারের অফুরন্ত আইডিয়া কাজ করার কথা। পাঁচটা মাত্র বেসিক মিউজিক্যাল নোট দিয়ে অসংখ্য মেলোডি বানান সম্ভব, যার সব শুনে শেষ করা অসম্ভব। পাঁচটা মৌলিক রং (সানজু কেন সাতটার জায়গায় পাঁচটা বলছে কে জানে?) মিশিয়ে এত অসংখ্য রং বানান সম্ভব, যার সব দেখে শেষ করা অসম্ভব। পাঁচটা মৌলিক স্বাদের সমন্বয়ে অসংখ্য স্বাদ বানান সম্ভব, যার সব চেখে শেষ করার নয়। তেমনি যুদ্ধে এই ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট মেনুভারের সমন্বয়ে এত অসংখ্য মেনুভার পরিকল্পনা করা সম্ভব যে কেউ একা এর সব কখনই আত্মস্থ করতে পারবে না। যেন একটা বৃত্তের মত, কোথায় এঁর শেষ কেউ জানে না।*

৩

পানির স্রোত যেমন পাথরের গায়ে আছড়ে পরে, তেমনি সৈন্যরা যুদ্ধক্ষত্রে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পরে, একে বলে

মোমেন্টাম। আর বাজ পাখি যেমন তার শিকারের ওপর মুহুর্তের ভেতর ঝাঁপিয়ে পরে তার পতনের মোমেন্টামটা কাজে লাগিয়ে শিকারের পিঠ ভেঙ্গে দেয়, একে বলে টাইমিং। শক্তি হল জ্যা যুক্ত তীর ছিলায় টানটান করে ধরে রাখাতে, আর সিদ্ধান্ত হল মোক্ষম সময়ে তা জ্যা মুক্ত করাতে। তাই দক্ষ সেনাপতির সেনাদলের গতি হবে অপ্রতিরোধ্য আর তার আক্রমণ হবে সময়োচিত আর সুনির্দিষ্ট।

৪

যুদ্ধের ডামাডোলে প্রথমে সব আপনার কাছে এলোমেলো ঠেকবে। কিন্তু আপনি যদি বিচক্ষণ কমান্ডার হন, আপনি জানেন আপনার সেনাদল কখন কি করতে যাচ্ছে। আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে আপনার সেনাদল যথেষ্ট সুশৃঙ্খল, শুধুমাত্র তখনি আপনি বিশৃংখলার ভান করতে পারেন; আপনার সেনাদল যদি আসলেই দুঃসাহসী হয়ে থাকে, তাহলেই কেবল আপনি ভীতু হবার ভান করতে পারেন; আপনি যদি সত্যি সক্ষম হন, শুধু তখনই আপনি দুর্বল সাজার ভান করবেন; আর এসবই আপনি করবেন আপনার শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে, যেন সে ভুল একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। মনে আছে নিশ্চয়, ইটস অল এবাউট ডিসেপসন!

গোছানো অথবা এলোমেলো হওয়াটা নির্ভর করে সাংগঠনিক দক্ষতার উপর। ডিভিসিবিলিটি সেনাদলসমূহের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট, এর মানে হল প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত বিভিন্ন সাইজে আর ফরমেশনে বদলে যাওয়া। যেমন অশ্বারোহীদের

বিরুদ্ধে যে সেনাদল তাদের ঢাল পাশাপাশি ধরে দেয়াল তৈরি করে নিজেদের বাঁচায়, তারাই আবার সেই ঢাল দিয়ে চাল বানিয়ে উড়ে আসা তীর ঠেকায়।

পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে পরে ব্যাট করতে নামা দলের সামনে লক্ষ্য যদি থাকে ৮২ রান, সেই পরিস্থিতিতে ওপেনাররা নেমেই চার ছক্কা হাকাতে থাকে। আবার ঐ একই দল যখন ২৪৫ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ৪টা উইকেট হারায়, তখন ব্যাটিং হয়ে যায় সিঙ্গেল-ডাবলস নির্ভর। তেমনি একই সেনাদল অনুকুল পরিস্থিতিতে দুঃসাহসের পারাকাষ্ঠা দেখায়, আবার প্রতিকুল পরিস্থিতিতে ভীরুর মত লড়ে। একইভাবে রণকৌশলগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আপাত সামর্থ্য বদলে যেতে পারে সীমাবদ্ধতায় কিংবা উল্টাটাও হতে পারে।

তাই দক্ষ সেনাপতিরা যুদ্ধে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেন শত্রু প্রলুব্ধ হয়ে তার পাতা ফাঁদে পা দেয়, একে বলে কেনালাইজিং অথবা বলতে পারেন শত্রুকে পুর্ব পরিকল্পিত কিলিং জোনে টেনে নিয়ে আসা। আপনি যদি বিচক্ষণ কমান্ডার হন, তাহলে আপনি কখনই শুধু আপনার সেনাদল যে যুদ্ধে লিপ্ত আছে তার উপর ভরসা করে বসে থাকবেন না। আপনি পরিস্থিতি নিবিরভাবে পর্যবেক্ষন করতে থাকবেন আর থাকবেন একটা সুযোগের অপেক্ষায়। যুদ্ধ শুধু যোদ্ধাদের লড়াই দিয়ে জেতা যায় না, যুদ্ধ জিততে চাই সুযোগ সন্ধানী কমান্ডার, যিনি প্রতিপক্ষের আগে সুযোগটা চিনে নিতে পারেন আর কাজে লাগাতে জানেন।

কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে চাই উপযুক্ত লোক নির্বাচন যারা কমান্ডারের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে সমর্থ। উপযুক্ত লোক হল গাছের গুড়ি অথবা পাথরের চাই এঁর মত। প্রত্যাশিত হল সমতল ভুমিতে এরা স্থির থাকলেও, ঢালু ভুমিতে এরা গড়িয়ে এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে। এখন আপনি এদের একটা ঢালু ভুমি্র পাশে এনে দাড় করালেন, মানে একটা সুযোগ দিলেন, এখন এদের কাজ গড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর আছড়ে পড়া। কিন্তু আপনার গুড়ি অথবা পাথর যদি হয় চারকোনা তাহলেই বিপদ। কারণ গোলাকার গুড়ি-পাথর ভালই গড়াবে, কিন্তু চারকোনা হলে পথে স্থানেস্থানে এরা আটকে যাবে! তাই প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত লোক নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সঠিক নির্বাচনের জন্য আপনাকে আপনার অধস্তনদের আগে থেকেই খুব ভাল করে চিনতে হবে।

৫

যুদ্ধে তিন রকমের পরিস্থিতি হতে পারে;

এক. মনোবলের দিক থেকে জেনারেল, তার কমান্ডারেরা আর সৈনিকেরা লড়তে ভালবাসছে আর তারা জয়ের জন্য উদগ্রীব।

দুই. টেরেইনের প্রেক্ষিত, এমন একটা এলাকা ডিফেন্ড করতে হবে যেখানে প্রবেশের রাস্তা কুকুরের ঘরে ঢোকার দরজার মত সংকীর্ন অথবা পাহাড়ী এলাকার ভেতর দিয়ে ভেড়ার পাকস্থলীর মত রাস্তা আকাবাকা রাস্তা, যা হয়েই শত্রুকে তার কাছে আসতে হবে।

তিন. শত্রুর অবস্থার প্রেক্ষিতে, যখন শত্রু যুদ্ধ আর পথশ্রমে ক্লান্ত অথবা শত্রু এখনো তার শিবির স্থাপন করে সারেনি কিংবা শত্রুদলের অর্ধেক কেবল একটা নদী পার হয়েছে বাকি অর্ধেক এখনো নদীর ওপাড়ে। উপরের তিনটি পরিস্থিতিই যেকোন কমান্ডারের জন্য সুযোগ বিশেষ। সানজুর মতে, এমন সুযোগে একজন কমান্ডার এমন ভাবে তার সৈন্য পরিচালনা করে, যেন খাড়া ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পরা পাথরের বোল্ডার একেকটা, উপর থেকে ফেলতে ধাক্কা লাগে সামান্যই কিন্তু ফলাফল ভয়াবহ!

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29970669

ষষ্ঠ অধ্যায়: সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা

"Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbold."

খেলাফায়ে রাশেদীনের মুসলিম আর্মি যখন দামেস্ক দখলের পর এমেসাও দখল করে নিল, তখন বাইজান্টাইন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস উপায়ান্তর না দেখে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন। মুসলিম আর্মি তখন প্যালেস্টাইন, জর্ডান, দামেস্ক আর এমেসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সুযোগটা কাজে লাগাতেই হেরাক্লিয়াস পাঁচটা আর্মি রেডি করলেন একের পর এক এই বিচ্ছিন্ন মুসলিম সেনাবাহিনী ধ্বংস করতে। বাইজান্টাইন আর্মিরা যখন এলেপ্পো আর এন্টিওখ থেকে মার্চ করে, তখন এমেসায় মুসলিম কমান্ডার ছিলেন আবু উবাইদা। খলিফা উমরের সাথে খালিদের খুব একটা সদ্ভাব কখনই ছিলনা, কিন্তু এই বিশাল প্রতিপক্ষকে সামলাতে খালিদের কোন বিকল্পও ওমরের নেই।

তাই এই কেম্পেইনে মুসলিম আর্মি কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ পেয়েই খালিদ প্রথম যে কাজটা করল, তা হল প্যালেস্টাইন, জর্ডান, দামেস্ক আর এমেসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব মুসলিম ইউনিট গুলোকে ইয়ারমুখ প্রান্তরে জড়ো হতে আদেশ দিল, এই ব্যাপারটাকে যুদ্ধের ভাষায় বলে ফোর্স কন্সেন্ট্রেট বা মাস করা।

এতে বাইজান্টাইন প্ল্যান দুই ভাবে ধাক্কা খেল-

এক. বিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম আর্মিকে একের পর এক ধংশের প্ল্যান বাতিল করতে হল;

দুই. খালিদ ইয়ারমুখের প্রান্তরে কন্সেনট্রেট করায় যুদ্ধক্ষত্র এমেসা থেকে সরে গেল, ফলে বাইজান্টাইন আর্মিকে এবার দ্বিগুন দুরত্ব পেরিয়ে ইয়ারমুখে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, এবং পথে একমাত্র লজিস্টিক বেইজ দামেস্ক (যা সদ্য মুসলিম আর্মি এবান্ডন করে গেছে) পাঁচটা বাইজান্টাইন আর্মির লোড নিতে পারবে কিনা, তা নিশ্চিত না।

খালিদ ইয়ারমুখের যুদ্ধক্ষত্রে পশ্চিমদিকে মুখ করে বাইজান্টাইনদের জন্য অপেক্ষায় থাকল। এই যুদ্ধে বাইজান্টাইন রোমানরা এমন শোচনীয় ভাবে হারল যে কট্টর ইসলাম বিরোধী ইতিহাসবিদও স্বীকার করেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন সর্বকালের সেরা ক্যাভেলরি জেনারেল।

১

সানজু বলেন, *যুদ্ধক্ষত্রে যারা আগে পৌছায় তারাই ধীরে সুস্থে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে, আর যারা পরে পৌছায় তারা তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভোগে। তাই বিচক্ষণ কমান্ডারেরা আগেই যুদ্ধক্ষত্রে পৌছে শত্রুর জন্য অপেক্ষায় থাকেন আর শত্রুকে তার টার্মস এন্ড কন্ডিশনে লড়তে প্রায় বাধ্য করেন। একে বলে ইনিশিয়েটিভ। আর যুদ্ধক্ষত্রে যার ইনিশিয়েটিভ বেশি, সে আগে অ্যাক্ট করে, শত্রু স্রেফ তার অ্যাক্টের এগেইনেস্টে রিয়েক্ট করে যায়।*

মনে রাখার বিষয় হল, শত্রুর আক্রমণের তোপে আপনার সেনাদল যখন এলোমেলো পিছুহটে, একে বলে পলায়ন। আর শত্রু আপনাকে এনগেজ করার আগেই আপনার সেনাদল যখন পিছুহটে সুবিধাজনক কোন নতুন অবস্থান নেয়, সেইটারে বলে পশ্চাদপসরণ। অবশ্য দিনশেষে ক্যাম্পে ফিরে আসাকে পলায়ন বলে না।

আপনি যদি চান শত্রুকে আপনার সুবিধামত জায়গায় এনে কুপোকাত করতে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু ছাড় দিতেই হবে যেন সে এগিয়ে আসার আগ্রহটা পায়। আর যদি চান শত্রুকে দূরে রেখেই মোকাবেলা করতে, তাহলে শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে রাস্তায় তাকে হেনস্তা করুন, ক্রিটিকাল পয়েন্টে তাকে পর্যুদস্ত রাখুন।

প্রতিপক্ষ দুই জেনারেলের যুদ্ধ কিন্তু অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। যেন দাবার বোর্ডে মগ্ন দুই দাবারু, একে অন্যের প্রত্যেকটা চাল দেখছেন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজও পড়তে চেষ্টা করছেন। আপনার মুল ধান্দাই হল প্রতিপক্ষকে তার প্ল্যানের বাইরে ছিটকে দেয়া। যখন সে বিশ্রাম খুজছে, তাকে ক্রমাগত উৎপাত করুন; যখনই তার রসদ সরবরাহ স্ট্যাবল হয়, তখনি আপনি তার সাপ্লাই লাইনে হানা দিন; যখনই তাবু গেড়ে বসে, তখনি তাকে স্থান বদলাতে বাধ্য করুন। তার অরক্ষিত অংশে আঘাত করুন, যেন সে নিজেকে বাঁচাতে ত্রস্ত থাকে; এমন দিক দিয়ে আক্রমণ করুন, যার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

২

শত্রুর বাঁধা না থাকলে আপনার আর্মি মাইলের পর মাইল নির্বিঘ্নে মার্চ করে যেতে পারে। কিন্তু যখন আক্রমণ করবেন তখন শত্রুর সেইখানটায় আক্রমণ করুন যেখানে সে অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত। আর যখন প্রতিরক্ষায় থাকবেন তখন এমনভাবে ডিফেন্ড করুন যেন শত্রু সেখানে আক্রমণের কোন সহজ পথ খুজে না পায়। তাই সেই আক্রমণে সেই জেনারেলই সিদ্ধহস্ত, যার শত্রু ভেবে পায় না কোথা দিয়ে থাকে ঠেকাবে; আর প্রতিরক্ষায় সেই জেনারেলই সিদ্ধহস্ত, যার শত্রু খুজে পায় না কোন পথে আক্রমণ করবে।

প্যাটনের মত জাদরেল জেনারেলকে ২য় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে ডিসেপশন পারপাসে, যেন জার্মানরা ধরে নেয় নরম্যান্ডি ল্যান্ডিং অপারেশনটা আসলে হবে ক্যালাইসে। জার্মানরা এতোটাই ডিসিভড হইছিল যে, নরম্যান্ডি দিয়ে আক্রমণ শুরু হয়ে যাবার অনেকক্ষন পর পর্যন্ত তারা ধরে নিয়েছিল যে এইটা স্রেফ একটা ডাইভার্সনারি এটাক, আসল এটাক ক্যালাইস দিয়েই আস্তে যাচ্ছে। গোপনীয়তা দক্ষ জেনারেলের অন্যতম হতিয়ার, তিনি তার পরিকল্পনা ঘুর্নাক্ষরেও কাউকে টের পেতে দেন না।

যখন আপনি শত্রুর দুর্বল আর অরক্ষিত অংশের দিকে এডভান্স করবেন, তখন আপনি হয়ে উঠেন অপ্রতিরোধ্য। কারণ শত্রু তার প্ল্যানিং এঁর সময় এ রাস্তায় আপনাকে থামানোর যথেষ্ট এলিমেন্ট রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এখন আর তার কেঁচেগণ্ডূষের সময়

নেই। আর যখন পিছু হটবেন তখন এতো দ্রুত পিছুহটুন যেন শত্রু আপনার নাগাল পাবার আগেই কেটে পরতে পারেন। কেননা পিছু হটার সময় আপনার যেমন লড়াইয়ের কোন প্ল্যান নেই, তেমনি আপনার সেনাদলও লড়াইয়ের মানসিকতায় থাকেনা, তাই শত্রুর পারসুট বা পশ্চাৎ অনুধাবন থেকে সাবধান!

৩

মধুখেকো ভালুক যখন মৌচাক ভাঙ্গার চেষ্টা করে তখন মৌমাছি কিভাবে লড়ে? তারা কিন্তু সবাই মিলে ভাল্লুকের আকার ধারন করে লড়ে না, বরং ভনভন করে ভালুকের সারা গায়ে এমন হুল ফুঁটায় যে বিরক্ত হয়ে ভালুক মধু খাবার প্রোজেক্টে ইস্তফা দেয়। আপনি যদি আপনার শত্রুকে শেষ করার ধনুক ভাঙ্গা পন করে থাকেন, তাহলে শত্রুর সেই সব দুর্বলতাগুলোকে আঘাত করুন যেন সে তার সুরক্ষিত গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আপনার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। আর যদি আপনি তার সাথে লড়াই এড়াতে চান, তবে তার এগিয়ে আসার রাস্তা বরাবর এমন সব প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করুন যেন সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

ফ্রান্স-জার্মান সীমান্তে মেজিনো লাইন নামের এক প্রতিরক্ষা দেয়াল দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সকে জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এসেছে। এই মেজিনো লাইনের একটাই গ্যাপ ছিল যা আর্ডেন ফরেস্ট ঘেরা, আর ধারণা করা হত এই বনের ভেতর দিয়ে কোন সেনাদল মার্চ করানো অসম্ভব। তাই এই অংশটা তেমন হেভিলি গার্ডেড ছিলোনা। ২য় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা যখন ফ্রান্স আক্রমণের

পায়তারা করছিল, তখন মিত্রবাহিনী ভেবেছিল যে জার্মানরা বোধহয় এবারও বেলজিয়াম হয়ে আক্রমণ করবে। কিন্তু জার্মানরা প্রায় অগম্য আর্ডেন ফরেস্ট হয়ে ফ্রান্সের ভেতর ঢুকে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় আর ৬ সপ্তাহে গোটা ফ্রান্স দখল করে ফেলে।

যখন আপনি আপনার সারা ফ্রন্ট জুড়ে সমান ভাবে ফোর্স ভাগ করে শক্তিশালী হবার চেষ্টা করবেন, তখন আসলে কোথাওই আপনি তেমন শক্তিশালী হতে পারবেন না। তাই একটা ফ্রন্টের সবটা কখনই একসাথে সুরক্ষিত করা সম্ভব না। বরং প্রতিরক্ষার জন্য একেকটা সেনাদল বা ইউনিট কে ফ্রন্ট জুড়ে একেক এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়। এখন আপনি যদি শত্রুর এই ডিসপোজিশনটা জেনে তার যেকোন একটা ইউনিটের বিরুদ্ধে আপনার তিনটা ইউনিট জড়ো করে আক্রমণ করতে পাঠান, তাহলে সেই সময়ের জন্য শত্রুর ঐ ইউনিট এলাকায় বেলিজারেন্ট রেশিও দাঁড়ায় ৩:১। সুতরাং আপনার জয়ের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেড়ে গেল। আপনার সৈন্য সংখ্যা যখন শত্রুর চেয়ে কম, তখন আপনার উচিত শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া; আর আপনি যদি শত্রুর চেয়ে সংখ্যগরিষ্ঠ হন, তাহলে এইবার আপনার শত্রুর টার্ন আপনাকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার।

৪

‘ডি-ডে’ মানে যেদিন যুদ্ধ শুরু হবে, আর এইচ-আওয়ার মানে যখন শুরু হবে। এখন এই ডি-ডে আর যুদ্ধক্ষত্র সম্পর্কে যদি

আপনার কোন ধারণাই না থাকে তাহলে আপনার আর্মি যুদ্ধ শুরুর পর খেই হারিয়ে ফেলবে। এ অবস্থায় আর্মির এক অংশ আরেক অংশকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত সাপোর্ট দিতে পারেনা। তাই বিচক্ষণ কমান্ডার মাত্রই জানেন কবে কোথায় তার সেনাদল লড়বে, বেইজ থেকে ব্যাটেল ফিল্ডের দুরত্ব কত। এবার তিনি তার সেনাদলকে ম্যানেজেবল সাইজে ভাগ করে আলাদা আলাদা কলামে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যান। যুদ্ধক্ষত্র থেকে যারা দূরে তাদের তিনি আগে মুভ করান, আর যারা কাছে তাদের পরে; যেন প্রায় একই সময়ে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

৫

সানজুর দাবি হচ্ছে, আপনি চাইলেই বিজয়ী হতে পারবেন, এমনকি শত্রু আপনার চেয়ে শক্তিশালী হলেও পারবেন। আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুর প্ল্যানটা আপনাকে জানতে হবে, আর সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে, স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। শত্রুকে ক্রমাগত উত্যাক্ত করে তার প্রতিক্রিয়ার প্যাটার্নটা বের করতে হবে। শত্রুর মোতায়েন জেনে কাঙ্খিত ব্যাটেলফিল্ড খুজে বের করতে হবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার স্ট্রেন্থ আর উইকনেসগুলো জেনে নিতে হবে। তারপর তুলনামুলক বিচারে ঠিক করতে হবে আক্রমণ করবেন, নাকি ডিফেন্সে যাবেন। ডিফেন্সে গেলে আপনার মোতায়েনকে যথাসম্ভব গোপন রাখুন, যেন চতুরতম গুপ্তচরও সেগুলো খুজে না পায়। আর এইসব যদি নিশ্চিত করতে পারেন, কেউ আপনাকে হারাবার পরিকল্পনা করতে পারবে না।

৬

সবাই যুদ্ধজয়ে আপনার ট্যাকটিকসটা দেখতে পাবে, কিন্তু কেউ যেন আপনার স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে কোন ধারণা না পায়। একই ট্যাকটিকসের পুনরাবৃতি করবেন না, প্রত্যেক পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে আপনার ট্যাকটিকসেও নতুনত্ব আনুন। মিলিটারি ট্যাকটিকস বহমান স্রোতধারার মত। স্রোতধারা যেমন পাথরের চাই এড়িয়ে এগিয়ে যায়, আপনিও তেমনি শত্রুর স্ট্রেন্থ এড়িয়ে তার দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতাতে আঘাত করুন। পানি যেমন পাত্র অনুযায়ী আকার নেয়, তেমনি পরিস্থিতি অনুযায়ী যুদ্ধ করতে শিখুন। পানির যেমন নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, আপনিও যুদ্ধক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নিতে যাবেন না। তাই, যুদ্ধের পরিস্থিতি ভেদে আপনি যদি আপনার রনকৌশল সমন্বয় করতে জানেন, আপনিও হয়ে উঠতে পারেন অজেয় এক সেনাপতি। মনে রাখবেন, পানি-আগুন-কাঠ-ধাতু-মাটি এই সবই রূপান্তরিত হয়; কোন ঋতুই আজীবন থেমে থাকে না; দিনও বাড়ে কমে; চাদেরও অমাবশ্যা-পূর্নিমা আছে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29970778

সপ্তম অধ্যায়: মেনুভার

Swift as the wind/Quiet as the forest/Conquer like the fire/Steady as the mountain.

'৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষদিকে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ প্রায় নিশ্চিত, তখন জেনারেল নিয়াজি উপলব্ধি করলেন নিরীহ বাঙালি মারার 'অপারেশন সার্চ লাইট' কন্সেপ্ট দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির মোকাবিলা করা অসম্ভব। অতএব অক্টোবর '৭১ নাগাদ তিনি তার প্ল্যান রিভিউ করে তার ডিফেন্স ঢেলে সাজেলেন। নতুন এই কন্সেপ্টে তিনি বর্ডার আউটপোস্ট বরাবর ১ম লাইন, বর্ডার থেকে ঢাকামুখী মহাসড়কের ওপর বড় বড় শহর বরাবর ২য় লাইন, এবং ঢাকার বাইরে আর ভেতরে মিলিয়ে আরো দুই লাইন, মোট চারস্তরে ডিফেন্স নিলেন, যাকে বলা হল ফোর্ট্রেস কন্সেপ্টে ডিফেন্স। নিয়াজির আশা ছিল ২য় লাইন বরাবর ডিফেন্সটা ক্লিয়ার করে ঢাকা পর্যন্ত আসতে আসতে ইন্ডিয়ানদের খবর হয়ে যাবে। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা ২য় লাইনের ডিফেন্স ক্লিয়ারের ধারে কাছেও গেলনা। বরং মুক্তিবাহিনী আর সাধারণ জনগনের সহায়তায় তারা ২য় লাইনের পাক ডিফেন্সিভ পজিশনগুলো স্রেফ বাইপাস করে সোজা ঢাকার উদ্দেশ্য এগুতে লাগল। ইন্ডিয়ান কোরগুলোর মধ্যে মোটামুটি কম্পিটিশন চলছে তখন কে কার আগে ঢাকার উপকন্ঠে পৌছাবে। নিয়াজির বুজতে দেরী হল না যে আত্মসমর্পনের কোন বিকল্প নাই তার হাতে।

যুদ্ধ আপনি দুই কায়দায় লড়তে পারেন-

এক. সামনে আগাইতে থাকবেন আর পথে যত শত্রু পাবেন সব কচুকাটা করতে থাকবেন, একে বলে এট্রিশন ওয়ারফেয়ার।

দুই. মেনুভার করে শত্রুকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করবেন, একে বলে মেনুভার ওয়ারফেয়ার। যুদ্ধ যত আধুনিক হইছে, সেনাপতিরা তত মেনুভার ওয়ারফেয়ারের দিকেই ঝুকছে। মূলত অশ্বারোহী সেনাদের আবির্ভাবের পরপরই মেনুভার ওয়ারের শুরু, কারণ এই কিছিমের যুদ্ধে গতি একটা মুখ্য ইস্যু, আর গতিকে কাজে লাগিয়ে যে আগে সুবিধাজনক অবস্থানটা দখল করতে পারে সেই যুদ্ধে জেতে। রোমানদের বিরুদ্ধে হ্যানিবলের ব্যাটেল অফ ক্যাননি কিংবা পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে খালিদের ব্যাটেল অফ ওয়ালাজা পড়ে দেখতে পারেন। অধুনা সব যুদ্ধই অবশ্য এট্রিশন আর মেনুভারের সমন্বয়ে লড়া।

১

সানজু বলেন, কমান্ড পেয়েই জেনারেল সাহেব প্রথমে সৈন্য সংগ্রহ করেন, তারপর তীরন্দাজ, অশ্বারোহী, পদাতিক আর গোলন্দাজদের সমন্বয়ে বাহিনী সাজান। এরপর তার সেনাদলগুলোর ট্যাক্টিকাল মেনুভার নিয়ে ভাবতে বসেন। ট্যাক্টিকাল মেনুভারের সব চেয়ে জটিল বিষয় হল লক্ষ্যে পৌছানোর সহজতম অথচ নিরাপদতম পথ খুজে বের করা আর সীমাবদ্ধতাকে সুযোগে পরিনত করা। তাই আপনি আপনার শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে প্রথমে ভুল এক দিকে এগিয়ে

যান, তারপর হঠাত ঘুরে গিয়ে দ্রুত শত্রুর দিকে এগুতে থাকুন।

আপনার আর্মি যদি ওয়েল ট্রেইনড হয়, মেনুভার করে আপনি জিতবেন, আর যদি না হয়, তাহলে বিপদে পরবেন। একটা সুযোগ চোখে পরা মাত্র যদি আপনি আপনার গোটা আর্মি নিয়া ছুট দেন, সেইটা হবে বোকামি। কারণ তল্পিতল্পা নিয়া আপনার আর্মি যে গতিতে আগাবে, তাতে আপনি সুযোগটা হারাবেন; আর যদি ভারী অস্ত্র আর রসদ পিছনে ফেলেই আপনি রওনা দেন, তাহলে শত্রু এসে আপনার রসদ লুটে নিতে পারে।

আপনি যদি আপনার আর্মি নিয়া সাধারণ গতিতে আগান, তাহলে গড়পরতায় দিনে ১৫ মাইল যেতে পারবেন। জোর কদমে আগাইলে দিনে ৩০ মাইল, আর যদি দিনে ৫০ মাইল করে আগাইতে চান তাহলে না থেমেই দিনে রাতে সমানে হাটতে হবে। মনে রাখা ভাল, এইভাবে হাটতে থাকলে শীঘ্রই আপনি ধরা পরবেন আর যুদ্ধবন্দি হিসাবে হাটতে থাকবেন। কারণ সানজুর হিসাবে এই গতিতে আগাইলে আপনার সামনের সৈন্যরা যখন যুদ্ধক্ষত্রে প্রবেশ করবে, তখনো আপনার দশ ভাগের নয় ভাগ সেনা পেছনে পরে থাকবে। একই হিসাবে জোর কদমে ২৫ মাইল চলার পর যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছাতে গেলে সময় মত আপনার অর্ধেক সেনা পৌছালেও সামনের কমান্ডারদের হারানোর ঝুকি থাকে। আর যদি ১৫ মাইল দূরে এভাবে এগিয়ে যান তবে আপনার তিনভাগের দুই ভাগ সেনা সময়মত যুদ্ধক্ষত্রে ঢুকবে।

২

২য় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা থিয়েটারে মিত্রবাহিনীর সাথে লড়ছিল জাপানীরা। ইমফল-কহিমার যুদ্ধে কোহিমা থেকে বৃটিশদের হঠাতে জাপানীরা জেনারেল সাটোর নেতৃত্বে প্রাণপন লড়ছিল। কিন্তু রসদে যখন টান পড়ল, সাটো সত্বর পেছনে মেসেজ পাঠালেন রসদ চেয়ে। কিন্তু জবাবে জাপানী কোর কমান্ডার মুতাগাচি খাবারের বদলে পাঠালেন একগাদা গোলাবারুদ। খাবারের অভাবে সাটো তার ডিভিশন নিয়া পিছু হটলেন। জাপানি সামরিক ইতিহাসে উর্ধতন কমান্ডারের আদেশ ছাড়াই কোন ডিভিশন কমান্ডারের পিছুহটার রেকর্ড বিরল। সানজু বলেন, রসদ ছাড়া আর্মি কখনো জিততে পারে না।

৩

যেকোন কেম্পেইনের আগে জেনারেল হিসেবে আপনি অবশ্যই যুদ্ধক্ষত্রের ম্যাপ খুবই ভাল ভাবে স্টাডি করবেন। পথে কয়টা ঝুকিপুর্ন এলাকা আছে, কোন নদীর গভীরতা কত, কোন শহরের লোকের আচরণ কেমন এ সবই আপনার নখদর্পনে থাকা চাই। তারপরও লোকাল গাইডের কোন বিকল্প নাই। একমাত্র লোকাল গাইডের সাহায্যেই আপনি একটা এলাকার ভুমির সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারবেন।

আপনি যখন শত্রুদেশে আক্রমণে যাবেন তখন আপনাকে শত্রুর স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট গুলো চিনতে হবে, জানতে হবে তার বন-প্রান্তর যেখানে সেনাদল লুকিয়ে থাকতে পারে, রাস্তার দুরত্ব জানতে হবে, রাস্তার কন্ডিশন আর ব্রিজের কথা জানতে হবে,

আরো জানতে হবে বিভিন্ন শহরের সাইজ, শত্রু সেনাদলের সংখ্যা, তাদের অস্ত্রের ধরন, ইত্যাদি সব। এসব জানা থাকলে, তবেই আপনি সহজে জিততে পারবেন।

৪

যুদ্ধ ধোঁকা নির্ভর, তাই সুযোগ বুঝে সামনে এগিয়ে যান, পরিস্থিতি বুঝে ফর্মেশন বদলান। যখন এগুবেন, তখন বাতাসের ক্ষিপ্রতায় আগান; আপনার সেনাদল যেন ঘন বনের মত একতাবদ্ধ থাকে। যখন শত্রু ওপর হানা দেবেন অথবা লুট করবেন তখন আগুনের তেজ দেখান, যখন থামবেন তখন পাহাড়ের মত অটল থাকুন। আপনার প্ল্যান হোক কালো মেঘের মত গভীর রহস্যময় আর যখন এগুবেন তখন বিদ্যুতগতিতে প্ল্যানমাফিক এগিয়ে যান। লুটের সময় আপনার সেনাদল ভাগে ভাগে এগুবে আর দেশ দখলের পর লুন্ঠিত সম্পদ সবাই ভাগাভাগি করে নেবে।

৫

পরিস্থিতি বুঝে চাল আর চলা শুরু করতে হয়। যিনি ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট এপ্রোচের কৌশল ভাল জানেন, তিনিই জয়ী হন। যুদ্ধে গলা শোনা যায়না, তাই ঢাক আর ঘন্টা বাজান হয়, সৈন্যরা যেহেতু একে অন্যকে পরিস্কা;২র দেখতে পারেনা, তাই প্রত্যেক ইউনিটের আলাদা পতাকা-ঝান্ডা ব্যবহার করা হয়। সৈন্যদের ফোকাসড রাখতেই এই আয়োজন, তাই যুদ্ধক্ষত্রে দুঃসাহসী কখনও একা এগোয় না আর কাপুরুষও কখনও একা ভাগে না। রাতে ব্যবহার হয় মশাল আর ড্রাম,

এবং দিনে পতাকা। এই হল বড় সেনাদলে সৈন্য পরিচালনার কৌশল।

৬

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন রিচার্ড পিরসে নামের এক ভদ্রলোক আর জেসি নামের এক ভদ্রমহিলাকে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠালেন। জেসি ছিলেন জেনারেল অচিনলেকের স্ত্রী আর পিরসে ছিলেন অচিনলেকের সহপাঠী আর এয়ার চিফ মার্শাল, এরা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, যা মাউন্টব্যাটেন জেনে গিয়েছিলেন। ভারতে আসার আগে অচিনলেক ছিলেন নর্থ আফ্রিকায় মিত্রবাহিনীর মিডল-ইস্ট কমান্ডের কমান্ডার। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে তিনি তবরুক থেকে জার্মান জেনারেল রোমেল (যিনি ডেজার্ট ফক্স নামে সমাধিক পরিচিত) কে পিছু হটতে বাধ্য করেন। কিন্তু ১৯৪২ সালের জুলাইয়ের ভেতর তার অষ্টম আর্মি রোমেলের প্যাঞ্জার ডিভিশনের কাছে মার খেয়ে পিছু হটতে লাগল। তার আন্ডারের সব জেনারেলদের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হতে লাগল। মে মাসে গাজালার যুদ্ধে রোমেল তাকে আরেকবার হারাল আর অষ্টম আর্মি পিছুহটে এল-আলামিনে ঠাই নিল। অবস্থার বেগগতিক দেখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্বয়ং আফ্রিকা এলেন আর অচিনলেককে কমান্ড থেকে সরিয়ে নিলেন। অচিনলেকের এই হারিয়ে যাবার পেছনে তার স্ত্রী জেসির পরকীয়ার ভূমিকা নিয়ে ইতিহাস নিরব। সানজু বলেন, কখনো কখনো যুদ্ধে গোটা আর্মির সৈনিকদের মনোবল যেমন

উবে যেতে পারে, তেমনি কমান্ডারও সাহস হারিয়ে বসতে পারেন।

৭

সকালে সৈন্যদের মনোবল সবচে চাঙ্গা থাকে, দুপুরের দিকে তা মিইয়ে যেতে থাকে, আর সন্ধ্যে নাগাদ তারা তাবুতে ফিরতে উন্মুখ হয়ে উঠে। তাই যখন শত্রু সৈন্যদের মনোবল সবচে চাঙ্গা থাকে, বিচক্ষণ জেনারেল তখন তাদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যান, আর যখন তা মিইয়ে যেতে তখনই ক্ষুরধার আক্রমণ করেন; একেই বলে শত্রুর মনোবল বুঝে যুদ্ধের কৌশল। ধুর্ত জেনারেল সুশৃঙ্খল আর শান্ত হয়ে অপেক্ষায় থাকেন কখন তিনি শত্রু শিবিরে অস্থিরতা আর বিশৃংখলার আভাস পাবেন; একে বলে শত্রুর মানসিক অবস্থা বুঝে যুদ্ধের কৌশল। ঝানু সেনাপতি শত্রু সেনাদের ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হওয়া পর্যন্ত ওঁত পেতে থাকেন; একে বলে শত্রুর শাররিক দুরবাস্থার সুযোগ বুঝে যুদ্ধের কৌশল। তিনি চমৎকার ফরমেশনে এগিয়ে আসা শত্রুকে কখনো আক্রমণ করেন না, অপেক্ষা করেন শত্রুর ফরমেশনে ভাঙ্গন ধরার; একে বলে অনুকুল পরিস্থিতি বুঝে যুদ্ধের কৌশল।

৮

সানজু বলেন, যখন শত্রু উঁচুতে আর আপনি নিচে, তখন তাকে আক্রমণ না করাই সমীচিন; আর উঁচু ভুমি থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসা আক্রমণ ঠেকাতে না যাওয়াই উত্তম। সানজুর এই কথা না মেনেই আমেরিকান সিভিল ওয়ারে গেটিসবার্গের যুদ্ধে

কনফেডারেট জেনারেল লী, ১২৫০০ সৈন্য নিয়ে সিমেট্রি রিজের ওপর অবস্থান নেয়া ইউনিয়ন বাহিনীকে আক্রমণ করেন। এই পিকেটস চার্জে কনফেডারেটরা তাদের অর্ধেক সেনা হারায়, আর এই ক্ষতি পরে আর কখনই তারা পুষিয়ে উঠতে পারেনি। আধুনিক বিল্ড আপ এরিয়া বা নগরযুদ্ধেও একি কথা প্রযোজ্য, কেননা উঁচু দালানের জানালায় দাড়িয়ে শত্রু অনেক দূর দেখতে পায় আর নিচ থেকে উঁচুতে গুলি টার্গেটে লাগানো কঠিন।

সানজু আরো বলেন, শত্রুর এলিট ফোর্সকে সরাসরি আক্রমণ করতে যাবেন না, কারণ এদের মনোবল সবসময় তুঙ্গে থাকে, তাই হারানো কঠিন। আর শত্রুকে পালাতে দেখলেই পিছু নেবেন না। কারণ শত্রু অনেক সময় এভাবেই আপনাকে প্রলুব্ধ করবে তার পিছু পিছু গিয়ে যেন আপনি তার পাতা ফাঁদে পা দেন। পিছু হটার সময় শত্রু তার খাবার আর পানিতে বিষ মিশিয়ে যেতে পারে, তাই পিছুহটা শত্রুর ফেলে যাওয়া খাবার পরীক্ষা না করে খাবেন না।

সম্রাট শুয়ান এঁর শাসনামলে চিয়াং গোত্রের বিদ্রোহ দমাতে গিয়েছিলেন রাজা চাউ চুংকু। তার বিশাল বাহিনী দেখে বিদ্রোহীরা ফেরিতে করে ইয়েলো নদী পেরিয়ে পালাতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে চাউ চুংকু তার সেনাবাহিনীর চলার গতি আরো শ্লথ করতে আদেশ দিলেন। বিস্মিত সেনাপতিরা রাজাকে জানাল যে তারা চাইলেই এখন ইয়েলো নদীর পাড়ে ফেরিটা ডুবিয়ে দিয়ে সব বিদ্রোহীদের কচুকাটা করতে পারে,

তাই এমন মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। রাজা বললেন, ওরা এখন পালাবার জন্য বেপরোয়া হয়ে আছে। আমরা যদি সুযোগ দেই তাহলে ওরা কোনদিক না তাকিয়ে ফেরির পর ফেরি ভরে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি এখন আক্রমণ করি ওরা জানে ওদের পেছনে নদী তাই পিছুহটার উপায় নেই। আর কোণঠাসা পশু অথবা মানুষ ভয়ংকর, এরা অপার্থিবের মত লড়বে আর আমাদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে।

যুদ্ধশেষে বাড়ীর পথে রওয়ানা দেয়া সেনাদলকে আক্রমণ করতে বারন করেছেন সানজু। কারণ, এসময় সৈন্যরা বাধাগ্রস্ত হলে আবেগে উন্মাদ হয়ে লড়ে। আরো বলেছেন শত্রুকে ঘিরে ফেলার পর তাকে কোনঠাসা না করে পালাবার জন্য একটা রাস্তা খোলা রাখতে, কারণ যুদ্ধের মানসিকতা ঝেড়ে যে একবার পালাবার মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়, তাকে হারানো সহজ। সবশেষে সানজু সাবধান করেছেন কোণঠাসা শত্রুকে পারতপক্ষে আক্রমণ না করতে। এই হল সানজুর সেনাদল মোতায়েন আর পরিচালনার নিয়ম।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29971158

অষ্টম অধ্যায়: চিরায়ত রণকৌশলে নয়টি ব্যতিক্রম ভাবনা

জার্মান সেনাবাহিনীতে 'নরমাল ট্যাকটিকার' এবং 'অফট্র্যাগস ট্যাক্টিক' নামের দুই ধরনের সৈন্য পরিচালনা পদ্ধতি বিদ্যমান। 'নরমাল ট্যাকটিকার' মানে আপনে জানেন কে আপনার বস। তিনি আপনারে কাজ ধরায়া দিবে আর আপনি কোথাও কোন ডাউট হইলে তার কাছ থেকে ক্লিয়ার করে নিবেন। আর 'অফট্র্যাগস ট্যাক্টিক' মানে আপনার বস আপনারে একটা কাজ ধরায়া দিবেন আর একটা টাইম লিমিট বলে দিবেন। এইবার আপনি আপনার মত টাইমলি কাজ শেষ করে দিবেন। অযথাই কাজের মাঝখানে আপনি উনারে বারবার ডাউট দিয়া ত্যাক্ত করবেন না, আর উনিও আপনার জুরিসডিকশানের ভেতর নাক গলাবেন না। উনার সাথে আপনার বাতচিত হবে মুলত তিন পদের; মিশন একোমপ্লিশ হইলে 'ওয়েলডান', না হইলে 'থ্যাঙ্ক ইউ, উই উইল টেক ইট ফ্রম হেয়ার' আর মাঝে মাঝে শুনবেন 'মিশন এবোর্ট, কাম ব্যাক'। অবশ্য প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী কোন আর্মিতেই সর্বাধিনায়কেরা সাধারণত অধস্তন কমান্ডারদের কাজে বাগড়া দিতে যান না। এটাই সেনা রীতি।

সানজু বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সেনাপতি তার নিয়োগদাতার আদেশ অমান্য করেন। ভুল ব্যাখ্যার কারণে এই কথাটি প্রায়শই সানজুকে বিতর্কিত করে তোলে। সানজু আর তার 'আর্ট অব ওয়ার' এঁর গবেষকদের মতে, যখন একজন

জেনারেল অভিযানে বের হয়ে যান, তখন যুদ্ধক্ষত্রে সৈন্য পরিচালনায় তিনিই সর্বেসর্বা। অন গ্রাউন্ড কমান্ডার হিসেবে তিনিই নিবিরভাবে যুদ্ধক্ষত্রের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করেন, তাই ঐ মুহুর্তে তার নিয়োগদাতার কোন নির্দেশ যদি তার কাছে উপযুক্ত মনে না হয়, সেক্ষত্রে তিনি সেই আদেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজ পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যান এবং পরে তিনি এঁর কারণ তার নিয়োগদাতার নিকট ব্যাখ্যা করেন।

১

সেনাপতি হিসাবে গ্রাউন্ড আর টেরেইন দুইটা সম্পর্কেই ভাল ধারণা থাকা জরুরী। ম্যাপ বলতেছে এই রাস্তায় ট্যাঙ্ক যাবেনা, আপনি ভাবতেছেন উল্টাটা, তাহলে হবে না। 'দ্য নাইন ভেরিয়েবলস' বা 'নাইন চেঞ্জেস' নামের সানজুর এই চ্যাপ্টারটা কিছুটা এলেবেলে টাইপ, সম্ভবত এঁর কিছু অংশ ঐতিহাসিক ভাবেই হারিয়ে গেছে বলেই চ্যাপ্টারটা অভিব্যাক্তিতে এমন অসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিক ওয়াং শি মনে করেন এই চ্যাপ্টারে ব্যবহৃত 'নাইন' বা নয় দ্বারা অসংখ্যতা কেই বঝানো হয়েছে। এই চ্যাপ্টারে কিছু কথা আগের চ্যাপ্টারের রিপিটেশন, আবার ১১তম চ্যাপ্টার 'নয়টি পরিস্থিতি' এঁর সাথে সম্পর্কিত। যাহোক, ভুমির গঠনের প্রেক্ষিতে সানজুর পরামর্শ হল:

এক. নিচু ভুমিতে ক্যাম্প স্থাপন করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ উঁচুতে থাকা শত্রু আপনার সব কিছু দেখতে পাবে। তাছাড়া

ঢাল বেয়ে একপাল গরুও যদি স্ট্যাম্পিড করে নিচে পাঠায়, তাতেই আপনার ক্যাম্প তছনছ হয়ে যাবে।

দুই. মিত্রদের সাথে মিলিত হবার জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন এলাকা খুজে নিন। কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা যত ভাল প্রয়োজনের সময় রি ইনফোর্সমেন্টই বলেন আর রিজার্ভই বলেন, সবারই যাওয়া আসা সহজ আর দ্রুত হয়।

তিন. বিচ্ছিন্ন এলাকা থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসুন। কারণ এই এলাকায় আপনি আটকা পড়লে, রসদ পৌছানো যেমন কঠিন, তেমনি রি ইনফোর্স করাও কঠিন।

চার. চারপাশ সংকীর্ন এমন এলাকায় কৌশলের সাথে চলুন। কারণ এইসব এলাকায় শত্রুর এম্বুশে পরার ঝুকি বেশি।

পাঁচ. খোলা প্রান্তরে শত্রু পেলে অবশ্যই লড়বেন। কারণ এখানে জয় পরাজয় স্পস্টভাবে বোঝা যায়।

ছয়. কিছু রাস্তা আছে যা কখনো ব্যবহার করতে নেই। যেমন শত্রু বরাবর সংক্ষিপ্ত রাস্তা, কারণ এই রাস্তার মোড়ে মোড়ে শত্রু ফাঁদ পেতে রাখবে।

সাত. কিছু বাহিনী আছে যাদের আক্রমণ না করাই শ্রেয়। যেমন শত্রুর এলিট ফোর্স।

আট. কিছু শহর আছে যা আক্রমণ করতে নেই। যেমন পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে উঁচু দেয়াল ঘেরা শহরে অবস্থান নেয়া শত্রু।

নয়. কিছু এলাকা আছে যা নিয়ে লড়তে নেই। যেমন এমন এলাকা যা জয় করার পর রক্ষা করা কঠিন, অথবা এমন এলাকা

যার সাথে শত্রুর ইগো জড়িত অথচ আপনার কাছে তা স্রেফ জমি ছাড়া আর কিছুই না।

একজন বিচক্ষণ জেনারেল এইসব ভেরিয়েবেলস এঁর প্রেক্ষিতে যদি তার ট্যাকটিকস মডিফাই করতে না জানেন, তাহলে তার পক্ষে যুদ্ধ জয় অসম্ভব। প্ল্যানিং এঁর সময় তাকে অনুকুল আর প্রতিকুল উভয়বিধ ফ্যাক্টর সমুহ যাচাই করতে হবে। তাকে প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ঝুঁকি হিসেব করতে পারতে হবে।

২

শত্রুকে অনেকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। কখনো শত্রুর জ্ঞানীদের ভাগিয়ে এনে শত্রুকে উপদেষ্টা শুন্য করে ফেলা যায়; যেমন সুগ্রীব এসে রামের দলে ভিড়েছিল। কখনো কুচক্রীদের দিয়ে তার প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয়া যায়; অনেকটা ইদানিংকার আরব বসন্তের মত। কখনো তার প্রভাবশালী সভাসদদের কিনে ফেলা যায়; যেমন মীরজাফর। কখনো ক্ষতিকর সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে তাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়া যায়, যেমন ??? ; আবার কখনো সুন্দরী রমনী দিয়েও কাবু রাখা যায়। প্রতিপক্ষকে সবসময় কিছু না কিছু সমস্যায় জর্জরিত রাখুন আর মাঝে মাঝে কিছু সুবিধা দিন যেন তারা ব্যস্ত থাকে।

৩

কথায় আছে ঝড়ের আগে সব শান্ত লাগে। যদি দেখেন সেনাদল নিয়ে কোন বাঁধা ছাড়াই তরতরিয়ে এগুচ্ছেন, জেনে রাখুন সামনেই এম্বুশ পাতা আছে। তেমনি শত্রু এখনো আক্রমণ

করেনি মানে যে আক্রমণ করবেনা কখনো, এমন ভাবনা বোকামি। তাই নিজেকে প্রস্তুত রাখার বিকল্প নেই।

৪

সানজুর মতে জেনারেলদের পাঁচটা বৈশিষ্ট বড়ই খতরনাক-

এক. অতি সাহসী হলে সে অসম্ভব সব যুদ্ধে অযথাই জড়িয়ে পরে।

দুই. অতি সাবধানী হলে সে সারাক্ষন দ্বিধান্বিত থেকে সঠিক দময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

তিন. বদ মেজাজি হলে আগপিছ না ভেবেই যুদ্ধে গিয়ে সমস্যায় পরে।

চার. নিজের সুনাম নিয়ে বেশি সচেতন হলে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও আত্মসমর্পন না করে সবার মৃত্যু নিশ্চিত করে।

পাঁচ. খুব বেশি জনদরদী হলে নিজের সৈন্য হতাহত হবে ভেবে সে কোন ঝুঁকিই নেয় না, তাই যুদ্ধেও জেতে না।

জেনারেলদের এই পাঁচ চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সদা সচেতন থাকা উচিত। অন্যথায় সে নিজের আর তার আর্মির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29971328

নবম অধ্যায়: দ্য আর্মি অন দ্য মার্চ- ১

১

ইয়ারমুখ যুদ্ধের ৫ম দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মুসলিম ক্যাম্পের সীমানায় সাদা পতাকা হাতে বাইজান্টাইন দুত এসে দাড়াল। বাইজান্টাইন সেনাপতি ভাহান কয়েকদিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠিয়েছে খালিদের কাছে। তখনকার দিনে যুদ্ধেও এক ধরনের রাজসিক ভাব ছিল। যুদ্ধ শুরুর আগে সম্রাট হেরাক্লিয়াস আর খলিফা উমর দুজনই যখন কুটনৈতিকভাবে একটা সমাধানে পৌছাতে চেষ্টা করছিলেন, তখন এই ইয়ারমুখ প্রান্তরেই ভাহান আর খালিদ যার যার সেনাদল নিয়ে প্রায় একমাস মুখোমুখি তাবু গেড়ে বসে ছিলেন। এরিমধ্যে একবার ভাহানের নিমন্ত্রনে খালিদ বাইজান্টাইন ক্যাম্পে গিয়ে শান্তি আলোচনাও করে এসেছিলেন, ফলাফল যথারীতি শুন্য, কেননা দুজনই জানতেন যুদ্ধ শুরু বা বাতিলের সিদ্ধান্তটা তাদের কারও হাতে নেই, যুদ্ধ একান্তই রাজনৈতিক ইস্যু।

বাইজান্টাইনরা যখন ৫টা আর্মি নিয়ে ইয়ারমুখ প্রান্তরে এসে পৌছেছিল, ততক্ষনে খালিদ পজিশনাল এডভান্টেজ নিয়ে নিয়েছে। এমন এক জায়গায় তারা ক্যাম্প করতে বাধ্য হল, যার পেছন দিয়েই বয়ে গেছে ভয়ঙ্কর এক গিড়িখাত; ওয়াদি-উর-রুক্বাদ নামের এই গিরিখাত কোথাও কোথাও প্রায় ৬০০ ফিট গভীর আর একটাই মাত্র ব্রীজ ওপাড়ে যাবার। তার ওপর

খালিদের বাহিনী এমনভাবে ডেপ্লয় হয়েছে যে প্রান্তরের একমাত্র উঁচু জায়গা তেল-আল-জুম্মাও তাদের দখলে, এবং সকালে সূর্য থাকে মুসলমানদের পিঠে আর বাইজান্টাইনদের চোখে; দুপুরের আগ পর্যন্ত অনেকটা সময় বাইজান্টাইনরা প্রতিপক্ষকে ভাল করে দেখতেই পারে না।

যাহোক অবশেষে যুদ্ধ শুরু হল আর প্রথম ৪টা দিন ভাহান সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম প্রতিরক্ষা ব্যুহ গুড়িয়ে দেবার সবরকম চেষ্টাই করলেন। কিন্তু প্রতিদিনই খালিদের ক্যভুলরি ট্যাকটিকসের কাছে হার মানতে হল। ভাহানের সেনারা ইতোমধ্যে টানা আক্রমণ করে ব্যর্থ হতে হতে ক্লান্ত। তাই একটা যুদ্ধবিরতি বাইজান্টাইনদের জন্য খুবই দরকার। কিন্তু ধুর্ত খালিদ তাদের সেই সুযোগ কেন দেবেন? তাই ঐ রাতেই খালিদ তার ডিফেন্সিভ ফর্মেশন ঝেড়ে ফেলে অফেন্সিভ ফর্মেশনে ফোর্স সাজালেন। রাতেই বাইজান্টাইন ক্যাম্পের অনেক পেছন দিয়ে একটা কাট অফ পার্টি পাঠিয়ে দিলেন গিরিখাত পেরুবার একমাত্র ব্রীজ দখলের জন্য।

পরদিন মুসলিম আর্মির প্রচন্ড আক্রমণে বাইজান্টাইনরা এলোমেলো হয়ে ব্রিজের দিকে পিছু হটতে গিয়ে মুসলিম কাট অফ পার্টির কবলে পড়ল। খালিদ বাইজান্টাইনদের দামেস্ক পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে শোচনীয়ভাবে হারাল আর সম্রাট হেরাক্লিয়াস পবিত্র রেলিক নিয়ে ইজিপ্ট পালালেন।

সানজু বলেন, পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধের সময় দ্রুত পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে উপত্যকা দখল করতে হয়, যেন পানি আর

ঘাসের কমতি না হয়। তাছাড়া পাহাড়ী এলাকায় যাতায়তের পথ খুব সীমিত, তাই শত্রু এইসব প্রবেশপথ দখল করে ফেললে পাহাড়ি এলাকার ভেতর আটকে পরা সেনাদলের আত্মসমর্পন ছাড়া উপায় থাকে না।

ক্যাম্প করতে হয় অপেক্ষাকৃত উঁচু ভুমিতে যেন আপনার সামনের এলাকা আলোকিত থাকে আর সূর্য আপনার শত্রুর চোখের ওপর পরে, তাই বলে অনেক উঁচু পাহারের দুর্গম চুড়ায় কিন্তু নয়। পাহাড়ি এলাকায় উঁচু থেকে নেমে এসে আক্রমণ করবেন, আর ভুলেও পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঠে এসে পাহারের চুড়ায় আক্রমণ করতে যাবেন না।

খালিদ কি সানজুর আর্ট অব ওয়ার পড়েছিলেন কখনো, কে জানে? কিন্তু গেটিসবার্গের যুদ্ধের পিকেট চার্জেস এঁর নায়ক অথবা খলনায়ক, কনফেডারেট জেনারেল লী যে পড়েন নাই একথা নিশ্চিত। কারণ তিনি পাহাড়ের উপরে বসা ইউনিয়ন ফোর্সকে ১২৫০০ সেনা নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত বাজে ভাবেই হেরেছিলেন।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29971608

নবম অধ্যায়: দ্য আর্মি অন দ্য মার্চ- ২

২

২য় পিউনিক যুদ্ধে হ্যানিবেল যখন তার কার্থেজিয়ান আর্মি নিয়ে ট্রেবিয়া নদীর পাড়ে ক্যাম্প করলেন, তখন নদীর ওপারে রোমান আর্মি তখন জেনারেল সিপিওর নেতৃত্বে শক্তিবৃদ্ধি করছে। সুপেরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগা রোমান জেনারেলদের শায়েস্তা করতে হ্যানিবল ট্রেবিয়া নদীর পাড়ে এম্বুশ পাতলেন। তারপর সেই এম্বুশের ওপর দিয়ে একদল অশ্বারোহী পাঠালেন নদী পেরিয়ে রোমান ক্যাম্পের ওপর একটা ফেইন্ট এটাক দেখিয়ে এম্বুশের ওপর দিয়েই ফিরে আসতে।

যথারীতি রোমানরা ক্ষেপে গিয়ে ঐ পথেই একটা আর্মি পাঠাল কার্থেজিয়ানদের শায়েস্তা করতে। অর্ধেক রোমান সেনাদল যখন নদী পার হল, হ্যানিবেলের জেনারেলরা অস্থির হয়ে উঠলেন আক্রমণ করতে; কিন্তু হ্যানিবলের মনে ছিল অন্যকিছু। তিনি পুরো রোমান বাহিনীকে নদী পেরিয়ে আসতে দিলেন। তারপর তার মুল সেনাদল দিয়ে রোমানদের ওপর সাড়সি আক্রমণ চালালেন। বেগগতিক দেখে রোমানরা পিছুহটে নদী পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরতে চাইল, কিন্তু হ্যানিবেলের এম্বুশ এবার সক্রিয় হয়ে উঠল। চতুর্মুখি আক্রমণে দিশেহারা রোমানরা এলোমেলো হয়ে নদী সাঁতরে পালাল।

সানজু বলেন, সেনাদল নিয়ে নদী পার হবার পর দ্রুত নদী থেকে দূরে সরে আসুন। কেননা আপনার পেছন পেছন যদি

কোন শত্রুদলও নদী পার হয়, সেক্ষত্রে নদীর এপারে যুদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাটেল স্পেস যেন আপনার হাতে থাকে। আর যদি নদী পার হতে থাকা শত্রুকে আক্রমণ করতে চান, তবে অর্ধেক সেনাদল নদী পার হবার পর আক্রমণ করুন। এতে সুবিধা হল এম্নিতেই নদী পার হবার সময় সেনাদলকে যুদ্ধের ফর্মেশন ত্যাগ করতে হয়, তার ওপর অর্ধেক সেনাদল নদীর এপারে আর বাকিরা যখন নদীর ওপারে থাকে , তখন এটাক রেশিওটাও আক্রমণকারীর অনুকুলেই থাকে, তাই জয় প্রায় নিশ্চিত। আর যদি যুদ্ধ এড়াতে চান, তাহলে নদী পার হতে আসা শত্রুর সাথে লাগতে না যাওয়াই শ্রেয়। কারণ আধুনিক যুদ্ধে নদী পার হবার আগে ব্রিজহেড অপারেশন চালান হয়, আর যে আর্মির এমন সামর্থ্য থাকে, তার বিরুদ্ধে লড়ার মত যথেষ্ট শক্তিশালী যদি আপনি না হন, সেক্ষেত্রে আপনি নদী থেকে দূরে আপনার সুবিধামত জায়গায় ডিফেন্স নিন যেন শত্রু নদী পার হয়ে এসে আপনার ফাঁদে পা দেয়। আর যদি আপনি আফগান স্টাইলে যুদ্ধের কথা ভাবেন। সেক্ষত্রেও নদীর আশেপাশে না থেকে বরং মেইনল্যান্ডের আরো ভেতরে আপনার ডিফেন্সে মনযোগ দেয়াটাই লাভজনক।

আর যদি নদীর আশেপাশেই যুদ্ধ করতে হয় সেক্ষেত্রে ভাটি থেকে উজানে গিয়ে আক্রমণ করতে যাবেন না, বরং শত্রুর চেয়ে উজানে থাকতে চেষ্টা করুন। কারণ উজান থেকে শত্রু আপনার পানিতে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, ছোট নদী হলে সাময়িক ভাবে বাধ দিয়ে আর সুবিধামত সময়ে সে বাধ ভেঙ্গে

দিয়ে আপনার ক্যাম্প প্লাবিতও করতে পারে। এই হল নদীর আশে পাশে অবস্থান নেবার কৌশল।

৩

পথে লবন-কাদায় মাখামাখি এলাকা পরলে যত তারাতারি পারেন এই এলাকা পেরিয়ে যান। আর এখানে আক্রান্ত হলে ঘাস-পানি আছে দ্রুত এমন জায়গার কাছাকাছি পৌঁছান, আর পেছনে গাছ আছে এমন জায়গায় থেকে লড়ুন। কারণ ঘাস জন্মানো স্থানে মাটি কিছুটা শক্ত হয়, কাদায় আটকে পড়ার চেয়ে পানিতে সাত্রানো সোজা আর পেছনে গাছের বন প্রয়োজনের সময় আত্মগোপনের জন্য ভাল। এই হল কর্দমাক্ত এলাকায় লড়ার কৌশল।

৪

সমভুমিতে উঁচু ভুমি আপনার পেছনে আর ডানে রেখে সুবিধনক স্থানে অবস্থান নিন। পেছনের উঁচু ভুমি থেকে আপনার পর্যবেক্ষকরা সময়মত আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবে যে শত্রু পেছন থেকে আক্রমণের কোন পায়তারা করছে কিনা। আর ডান পাশে উঁচু ভুমি আপনাকে রক্ষা করবে ডান দিক দিয়ে আসা ফ্ল্যাঙ্কিং এটাক থেকে। আগেকারদিনে সেনাদলের বাম দিক এম্নিতেই সুরক্ষিত থাকত, কারণ বাম হাতে থাকত শিল্ড বা ঢাল। তাছাড়া চারদিক থেকে শত্রুকে সাম্লানর চেয়ে দুই দিক যেকোন বিচারেই স্রেয়। এই হল সানজুর চার ধরনের ভুমিতে নেচারাল এডভান্টেজকে কাজে লাগিয়ে লড়ার কৌশল।

৫

সব আর্মিই নিচু এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা পছন্দ করে, ইংরেজিতে বলে গ্রাউন্ড হায়ার দ্যান দ্য সারাউন্ডিংস। ক্যাম্প স্থাপনের জন্য স্যাতস্যতে এলাকার চেয়ে শুকনো এলাকা ভাল। কারণ শুকনো এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব কম, তাই সৈন্যরা ফিট থাকে। আর ফিট সৈন্যরাই যুদ্ধে বিজয়ী হয়। তাই নদীর পাড়ে বা পাহারের পাদদেশে শকনো আলোকিত স্থানে পেছনে আর ডানে উচুভুমি রেখে ক্যাম্প করুন।

প্রবল বর্ষনের কারণে ফুলে ওঠা নদী শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। প্রাকৃতিক ভাবে দুর্গম এলাকা পারতপক্ষে পরিহার করুন, আর যদি পার হতেই হয় তবে যত দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করুন। কারণ এসব এলাকায় শত্রু এম্বুশ পেতে রাখে আর এখানে ফর্মেশন অনুযায়ী যুদ্ধও করা যায় না। তাই নিজে এসকল এলাকা এড়িয়ে চলুন আর শত্রুকে এসব এলাকা দিয়ে আসতে বাধ্য করুন। চেষ্টা করুন শত্রু যেন এসব দুর্গম এলাকা পেছনে রেখে লরতে বাধ্য হয়, কারণ সদ্য পেরিয়ে আসা এসব দুর্গম এলাকার স্মৃতি আর ভীতি তাদের ব্যাকুল রাখবে। চলার পথে আর আপনার ক্যাম্পের আশেপাশের প্রত্যেকটা ঝোপ ভাল করে সার্চ করুন। এসব স্থানেই শত্রুর এম্বুশ আর গুপ্তচরেরা লুকিয়ে থাকে।

৬

শত্রু আপনার কাছাকাছি থাকার পরও যদি আক্রমণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার অবস্থানগত সুবিধাটা কাজে

লাগাতে চাইছে। যখন সে সামর্থ্য থাকা সত্বেও দূর থেকে আপনাকে যুদ্ধে যেতে ডাকে, তারমানে হল আপনাকে সে আপনার সুরক্ষিত অবস্থান থকে বের করে আনতে চাইছে, যেন তার পছন্দমত স্থানে পজিশনাল এডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে সে আপনাকে হারাতে পারে। যখন আপনার স্কাউটরা এসে জানাবে যে দূর বনে গাছপালা নড়ছে, বুঝবেন শত্রু রাস্তা সাফ করতে করতে এগুচ্ছে। ঘাসের ওপর অনেকসংখ্যক দৃশ্যমান প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে রাখার মানে, শত্রু আপনাকে ভীতি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, সাধারণত নিরাপদে পিছুহটার আগেই শত্রু এমন খোলামেলা ভাবে প্রতিবন্ধকতা বা অবসট্যাকেল পেতে রেখে যায়।

উড়ে আসা পাখি যখন ঝোপঝাড়ের উপর এসে আরো উপরে উড়ে যায়, বুঝবেন অখানেই শত্রুর সেনারা এম্বুশ পেতে লুকিয়ে আছে। চমকে ওঠা পশুপাখি দেখে বুঝবেন আক্রমের জন্য শত্রু হামাগুরি দিয়ে এগিয়ে আসছে। যখন দূর থেকে আকাশে ধুলার কুণ্ডলী কলাম বা স্তম্ভের মত আকাশের দিকে উঠে যেতে দেখবেন, বুঝবেন শত্রুর সাঁজোয়া যান এগিয়ে আসছে; আর যদি ধুলার মেঘ নিচু হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দেখতে পান, বুঝবেন শত্রুর পদাতিক দল এগুচ্ছে। যখন দেখবেন নিচু ধুলার মেঘ একখানে জমে আছে, বুঝবেন শত্রু ক্যাম্প করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর সেই মেঘের চার পাশে ছোট ছোট মেঘের ঘোরা ফেরার মানে, শত্রু রান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে অথবা ক্যাম্পের চারপাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ছোট ছোট পার্টি কাজ করছে।

৭

শত্রু যখন নরম সুরে কথা বলে অথচ তার যুদ্ধের প্রস্তুতি পুরোদমে চলতে থাকে, তারমানে সে এডভান্স বা অগ্রাভিযান করতে যাচ্ছে। আর শত্রু যদি উগ্র আচরণ করে আর অগ্রাভিযানের পায়তারা দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই সে পিছুহটার প্ল্যান করছে। শত্রুর দুত যখন নমনীয় স্বরে কথা বলে, বুঝতে হবে তারা পুনর্ঘটিত হতে সময় কিনতে চাইছে। কোন উপযুক্ত কারণ অথবা গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি ছাড়াই যখন শত্রু সন্ধির প্রস্তাব করে, বুঝতে হবে এঁর পেছনে নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

শত্রুর হাল্কা চ্যরিয়ট (সাঁজোয়া যান) গুলো যখন ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে এসে দুই ফ্ল্যাঙ্কে অবস্থান নেয়, বুঝতে হবে শত্রু যুদ্ধের জন্য ফরমেশন নিচ্ছে। যখন শত্রুসেনারা তাড়াহুড়া করে যার যার স্থানে পৌছানোর চেষ্টা করছে, বুঝতে হবে আক্রমণের সময় ঘনিয়ে আসছে। যখন শত্রুর অর্ধেক এগিয়ে আসে আর বাকিরা পালিয়ে যায়, তারমানে শত্রু আপনাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে।

যখন শত্রু সৈন্যদের তাদের অস্ত্রের ওপর ভর দিয়ে দাড়াতে দেখবেন, বুঝবেন তারা ক্ষুধায় ক্লান্ত। যখন পানি সংগ্রহে আসা সৈন্যরা পানির পাত্র ভরার আগে নিজেরা ঢকঢক করে পানি পান করে, বুঝবেন ক্যাম্পের সবাই পানির কস্টে আছে। শত্রু যখন সুযোগ পেয়েও এগিয়ে না আসে, তারমানে তারা ক্লান্ত-

বিদ্ধস্ত। শত্রু ক্যাম্পের ওপর পাখির আনাগোনা দেখলে বুঝবেন, তারা ক্যাম্প খালি করে চলে গেছে।

রাতে শত্রু ক্যাম্প থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসা মানে তারা কোন কারণে ভীত। সেনাদের ভেতর বিশৃংখলা দেখে বুঝবেন সেনাপ্রধান তার কতৃত্ব হারাচ্ছেন আর অফিসারদের আচরনে অসন্তোষ দেখলে বুঝবেন সেনাদলের ভেতর হতাশা ভর করেছে। চলার সময় এলোমেলো পতাকা দেখলে বুঝবেন সেনাদলের মনোবল তলানীতে এসে ঠেকেছে। যখন দেখবেন সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছে আর নিজেরাও পেটপুরে খেয়ে নিচ্ছে, কিন্তু কোন তৈজসপত্র ঝুলতে দেখছেন না আর তাবুও গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে, বুঝবেন তারা আক্রমণের জন্য শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যখন সৈন্যরা সুযোগ পেলেই ছোট ছোট দলে ফিসফাস করতে থাকে, এরমানে হল তারা তাদের জেনারেলের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। কমান্ডারদের বেশি বেশি পুরস্কার দিতে দেখলে, বুঝবেন তারা আত্ববিশ্বাসহীনতায় ভুগছে, কারণ দীর্ঘ কেম্পেইনের শেষ দিকে তারা সেনা বিদ্রোহের ভয়ে থাকে। আর বেশি বেশি শাস্তি দিতে দেখলে বুঝবেন কমান্ডাররা প্রচন্ড স্ট্রেস এ আছেন। যখন অফিসারেরা দোষী সেনাসদস্যদের শাস্তি দিতে ভয় পায়, বুঝবেন বিশৃংখলা চরমে পোছে গেছে।

যখন শত্রু যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে উতসাহ দেখায়, এরমানে তারা সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী। যদি মারমুখি শত্রুসেনারা আপনার সামনাসামনি হয়ে হম্বিতম্বি করে কিন্তু আক্রমণ না করে,

বুঝবেন শত্রু অন্যকোন দিকে দিয়ে ভিন্ন সেনাদলের সাহায্যে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

যুদ্ধে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে আক্রমণ করতে যাবেন না। সংখ্যায় কম মানে আপনার সরাসরি আক্রমণের সুযোগ কম। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় আক্রমণের সামর্থ্য থাকলে, কম সংখ্যক সৈন্য নিয়েই জেতা সম্ভব। যার দুরদৃস্টি নেই আর যে তার শত্রুকে অবজ্ঞা করে, নি নিশ্চয় তার শত্রুর কাছে পরাজিত হয়।

আপনার সৈন্যদের আস্থা অর্জনের আগেই যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তারা কখনও আপনার অনুগত হবেনা, আর শতভাগ আনুগত্য ছাড়া তারা আপনার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে চাইবে না। আবার আপনার আস্থাভাজন সৈন্যদের দোষের জন্য শাস্তি দিতে যদি আপনার হাত কাপে, তাহলেও কিন্তু আপনি আনুগত্য হারাবেন। তাই অবশ্যই আপনি আপনার সৈন্যদের সাথে মানবিক আচরণ করুন, কিন্তু শৃংখলার প্রশ্নে আপোষহীন হতে হবে। এভাবেই আপনি বিজয় নিশ্চিত করতে পারেন।

প্রশিক্ষনের সময় যদি কঠোর না হন তাহলে যুদ্ধক্ষত্রে আপনাকে পস্তাতে হবেই। একজন কমান্ডার যখন নিয়মিত প্রয়োজনীয় আদেশ দেন আর তার আদেশ প্রতিপালিত হল কিনা তা নিশ্চিত করেন, তখন তিনি তার সাথে তার সৈন্যদের সন্তোষজনক সম্পর্ক নিশ্চিত করতে পারেন।

www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29971807

দশম অধ্যায় : দ্য টেরেইন- ১

ইঙ্গ-ফরাসী শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজা ৫ম হেনরি তখন তার আর্মি নিয়ে ফ্রান্সের আজিনকোর্টে। সেই আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি ফ্রান্সে পা দিয়েছেন, এখন অক্টোবর শেষ হতে চলল। ফরাসীরা সেভাবে যুদ্ধের সুযোগই দিচ্ছেনা তাকে তাই সাফল্য বলতে কিছুই পাননি। তার ওপর চলতি বছরের যুদ্ধের মৌসুমও প্রায় শেষের দিকে। একেকটা কেম্পেইনের খরচ কম না, এভাবে খালিহাতে তো আর দেশে ফেরা যায় না, তাই সিদ্ধান্ত নিলেন নরম্যান্ডি হয়ে কেলাইস পর্যন্ত যাবেন। অবশেষে আজিনকোর্টের কাছে এসে তিনি ফ্রেঞ্চ আর্মির দেখা পেলেন।

নরম্যান্ডি থেকে কেলাইস যাবার পথে আজিনকোর্ট, রাস্তার বামে আজিনকোর্ট বন আর ডানে ট্রামেকোর্ট বন। এই দুই ঘন বনের মাঝের এলাকার দুই দিকে ইংলিশ আর ফ্রেঞ্চ আর্মি মুখোমুখি অবস্থান নিল। স্বভাবতই নিজ দেশের মাটিতে ফ্রেঞ্চরা সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু ইংলিশদের সুবিধা হল ঘন বনের কারণে ডান অথবা বাম থেকে আক্রান্ত হবার ভয় নেই। তাই যুদ্ধক্ষেত্রটা দুই বনের মাঝের খোলা জায়গাতেই সীমাবদ্ধ, যা আবার পুরোটাই চষা ক্ষেত, তারউপর বৃষ্টিভেজা কর্দমাক্ত।

এই যুদ্ধে ইংলিশরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফ্রেঞ্চদের হারিয়ে দিল। ফ্রেঞ্চ পরাজয়ের কারণ ত্রিবিধ-

এক. সীমাবদ্ধ যুদ্ধক্ষত্রে ফ্রেঞ্চ সেনারা এতবেশি ঘন হয়ে এগুচ্ছিল যে ইতিহাসবিদদের ভাষ্যমতে তাদের তৃতীয় সারির সেনারা ঠিক মত নিজের তরবারিই চালাতে পারছিলনা।

দুই. ইংলিশ লং বো তীরন্দাজদের নৈপুন্য।

তিন. যুদ্ধক্ষত্রের হাঁটু সমান কাদা ডিঙ্গিয়ে আসতে গিয়ে ফ্রেঞ্চ অশ্বারোহী আর পদাতিক উভয় সেনারা পথে বারবার আটকে যাচ্ছিল আর এই সুযোগে ইংলিশরা তীরন্দাজেরা আয়েশ করে লক্ষ্যভেদ করছিল। স্রেফ কর্দমাক্ত যুদ্ধক্ষত্রের সুবিধা কাজে লাগিয়ে আজিনকোর্টের এই ইংলিশ জয় সমর ইতিহাসে টেরেইনের গুরুত্ব অনুধাবনের অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

১

প্রুশিয়ান জেনারেল আর বিখ্যাত সমরবিদ কার্ল ভন ক্লসউইতজের মতে টেরেইন থেকে যুদ্ধে দ্বিবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। একঃ উপযুক্ত টেরেইন কখনো কখনো শত্রুর চলার গতি কমিয়ে দেয়, অথবা শত্রুকে ব্যাটেল ফর্মেশন ছেড়ে কলাম হিসেবে এগুতে বাধ্য করে। দুইঃ টেরেইনের বিভিন্ন ফিচার, যেমনঃ পাহাড়, বন ইত্যাদি, নিজ সেনাদলকে কাভার নিয়ে যুদ্ধ করতে সহায়তা করে। প্রথম সুবিধাটা শুধু ডিফেন্ডার দের জন্য প্রযোজ্য হলেও, দ্বিতীয় সুবিধাটা সবার জন্যই জরুরী। সানজুর মতে টেরেইন অবশ্য ছয় প্রকার-

এক. একসেসেবল গ্রাউন্ড। এ ধরনের এলাকায় যাতায়তের ভাল রাস্তাঘাট থাকে, তাই চলাচল সহজ আর দ্রুত হয়। একসিসেবল গ্রাউন্ডে যে আগে অপেক্ষাকৃত উঁচু আর

আলোকিত এলাকায় অবস্থান নিতে পারে, এবং তার রসদ সরবরাহ ঠিক রাখতে পারে; সেই সুবিধামত লড়তে পারে। সমর ইতিহাসের বেশিরভাগ যুদ্ধেই সেনাপতিরা অসংখ্যবার এভাবেই জিতেছেন।

দুই. এন্ট্র্যাপিং বা এন্ট্যাংলিং গ্রাউন্ড। যেমন পুরান ঢাকার গোলকধাধার মত এলাকা, যেখানে ডিরেকশন ঠিক রাখা কঠিন। এন্ট্র্যাপিং বা এন্ট্যাংলিং গ্রাউন্ড এ শত্রু যদি অপ্রস্তুত থাকে তো আপনি ঝটিকা আক্রমণ করে জিততে পারবেন। কিন্তু শত্রু যদি প্রস্তুত থাকে তবে এমন গ্রাউন্ডে তাকে হারানো কঠিন, আর একবার এই এলাকায় ঢোকার পর অক্ষত বেরিয়ে আসা আরো কঠিন। তাই এহেন এলাকায় যুদ্ধ অলাভজনক।

তিন. ইনডিসাইসিভ বা টেম্পোরাইজিং গ্রাউন্ড। এধরনের এলাকায় ছোটখাটো নদীনালা, কর্দমাক্ত চষা জমি ইত্যাদি থাকে, ফলে সেনাদলের গতি কমে যায়। ইনডিসাইসিভ বা টেম্পোরাইজিং গ্রাউন্ড এ আপনি নিজে প্রবেশ না করে শত্রুকে প্রলুব্ধ করুন যেন সে এগিয়ে আসে। আর যখনি তার অর্ধেকের মত ফোর্স এই এলাকা থেকে বের হয়ে আসবে আর বাকি অর্ধেক তখনো আসা বাকি, তখনি আপনি আক্রমণ চালাবেন।

চার. কনস্ট্রিকটেড গ্রাউন্ড। যেমন দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলা রাস্তা। চাইলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগুনো মুশকিল। কনস্ট্রিকটেড গ্রাউন্ড এ আপনি যদি আগে পৌছাতে পারেন তো ঐ এলাকায় প্রবেশের সব রাস্তা আপনি বন্ধ করে দিন। আর যদি আপনার শত্রু যদি আগেই পৌছে সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে

থাকে, তবে অরক্ষিত কোন রাস্তা খুজে দেখুন। যদি তাও না পাওয়া যায়, তাহলে আক্রমণের আইডিয়া বাদ দিন।

পাঁচ. প্রেছিপিশাস গ্রাউন্ড। যেমনঃ পর্বত সঙ্কুল বন্ধুর এলাকা। প্রেছিপিশাস গ্রাউন্ড এ আপনি আগে গিয়ে উঁচু আর আলকিত অবস্থান গুল দখল করে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করুন। আর যদি শত্রু আপনার আগেই এলাকার দখল নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে অনুসরনের চেষ্টা না করে বরং চেষ্টা করুন শত্রুকে ঐ এলাকার বাইরে নিয়ে আসতে।

ছয়. ডিসট্যান্ট গ্রাউন্ড। যে এলাকা নিজ অবস্থান থেকে অনেক দুরে এবং যেখানে যেতে পর্যাপ্ত রসদ জ্বালানী মজুদ থাকা চাই। ডিসট্যান্ট গ্রাউন্ড এ থাকা শত্রু যদি আপনার সমকক্ষ হয়, তাহলে তাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করা দুস্কর, আর আপনি যেচে গিয়ে লড়তে যাওয়াটাও অলাভজনক হবে।

প্রত্যেক জেনারেল যুদ্ধে যাবার আগে অবশ্যই টেরেইন নিয়ে বিশদ গবেষনা করেন। টেরেইনের প্রকৃতি তার রণ পরিকল্পনার অন্যতম ফ্যাক্টর। ইউ এস আর্মিতে প্রচলিত ইন্টেলিন্স প্রিপারেশন অফ ব্যাটেলফিল্ড পদ্ধতি এই বাস্তবতার আলোকেই তৈরি। প্রতিনিয়ত আপডেটেড করা এইসব ম্যাপের কারণেই পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে, যেকোন আবহাওয়ায় তাদের চেয়ে দ্রুত যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত আর্মি খুব কমই আছে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29972078

দশম অধ্যায়: দ্য টেরেইন- ২

"Opportunities multiply as they are seized."

৩

১৮৮৯ সাল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল আর বেলজিয়াম মিলে ইতোমধ্যে আফ্রিকায় যারযার উপনিবেশ ভাগ বটোয়ারা করে নিয়েছে। এমনকি ডেনমার্ক আর সুইডেনেরও নিজস্ব উপনিবেশ আছে। দুর্ভাগা ইতালির জন্য অবশিষ্ট ছিল স্রেফ সোমালিয়া, ইথিওপিয়া আর ইরিত্রিয়া। তাই বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ইতালি থেকে বিশাল এক জাহাজ সমরাস্ত্র পাঠানো হল ইথিওপিয়ার রাজার উপঢৌকন হিসেবে। কিন্তু ইতালিয়ানরা কি কষ্মিকালেও ভেবেছিল যে তাদের পাঠানো অস্ত্রের আঘাতে একদিন তাদের সেনাই মারা পরবে?

উপনিবেশ হিসেবে ইতালীর সাথে ইথওপিয়ার যে চুক্তি হল, সেখানে একটি অনুচ্ছেদ ছিল যার ইতালিয়ান অনুবাদ হল, এখন হতে ইথিওপিয়ান সরকারের যাবতীয় কুটনীতি ইতালীয় কতৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিন্তু ইথিওপিয়ান কতৃপক্ষ এঁর এমহেরিক অনুবাদ করলেন যে পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজা চাইলে ইতালীয় কতৃপক্ষের সহায়তা নিতে পারেন। বিষয়টি ইতালীয়দের পছন্দ হলনা। সুতরাং শুরু হল ইতালি-ইথিওপিয়ান যুদ্ধ।

অবশেষে টিইগ্রে এলাকার আদওয়া শহরের উপকন্ঠে জেনারেল বারাতিয়েরির বহুজাতিক ইতালীয় বাহিনী মুখোমুখি

হল রাজা মেনেলিকের ইথিপিওপিয়ান আর্মির। প্রায় অচল ম্যাপ, ধীর গতির রেমিংটন রাইফেল আর পাথুরে এলাকার জন্য অনুপযোগী বুট নিয়ে জেনারেল বারাতিয়েরির সেনাদলের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ১৫০০০, যাদের বেশিরভাগই আবার ইরিত্রিয়ান। পক্ষান্তরে রাজা মেনেলিকের ছিল ১,০০,০০০ এঁর বেশি যোদ্ধা আর অপেক্ষাকৃত উন্নত অস্ত্র শস্ত্র। দুপক্ষেই রসদের ভীষন ঘাটতি ছিল। অবশেষে রাজা মেনেলিক যখন আর এক রাত পরই পিছুহটবেন বলে ভাবছিলেন, তখনি গুপ্তচরেরা নিশ্চিত করল যে ইতালিয়ান সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

শোনা যায় যে, ইতালিয়ান জেনারেল জেনেশুনেই এই সুইসাইডাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এঁর কারণ ইতালিয়ান প্রধানমন্ত্রীর এক টেলিগ্রাম, যেখানে লেখা ছিল, "হয় আক্রমণ কর, নাহয় জেনারেল বালদিসেরার কাছে কমান্ড হস্তান্তর কর।" আক্রমণ শুরুর পর উপযুক্ত ম্যাপ আর যোগাযোগ ব্যাবস্থার অভাবে ইতালিয়ান বাহিনী খেই হারাতে সময় নিল না। সকালে শুরু হওয়া যুদ্ধ বিকেলের আগেই শেষ। প্রায় ৭০০০ ইতালিয়ান সৈন্য মারা পড়েছিল, ৩০০০ হল যুদ্ধবন্দী, পলাতক জেনারেল বারাতিয়েরি ক্ষমার অযোগ্য ভুল আক্রমণ পরিকল্পনার দায়ে ইতালিয়ান কোর্ট মার্শালের সম্মুখিন হলেন।

সানজু বলেন, অন্যান্য কন্ডিশন যদি একই থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার শত্রু যদি সংখ্যায় আপনার দশগুন হয়, পলায়ন ছাড়া আপনার আর গত্যান্তর নেই। যখন কোন আর্মির সৈন্যরা যথেষ্ট

প্রশিক্ষিত কিন্তু অফিসাররা দুর্বল হয়, তখন সেই আর্মিতে অবাধ্যতা ছড়িয়ে পরে। আর যখন উল্টোটা হয় তখন সেই আর্মি যেকোন অভিযানে ব্যর্থ হয়। যখন কোন জেনারেল আগপিছ না ভেবেই ক্ষুব্ধ হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে যায়, তিনি তার আর্মির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। যখন একজন জেনারেল দুর্বল আর কতৃত্বহীন হয়ে পড়েন, যখন তার আদেশ বোধগম্য না থাকে, যখন তার অফিসার আর সৈন্যরা সুনির্দিষ্ট নিয়োগে নিযুক্ত না থাকে আর সৈন্যরা এলোমেলো হয়ে ঘোরাফেরা করে, তখন সে আর্মিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যখন কোন জেনারেল তার শত্রুর শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে ব্যর্থ হন, তার দুর্বল সেনাদলকে শত্রুর শক্তিশালী সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠান আর নিজ সেনাদলের সম্মুখভাগে শক্তিশালী ভ্যানগার্ড দেবার আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করেন, তার আর্মি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই জেনারেলের মত এক দায়িত্বপুর্ন পদে অধিষ্ঠিত হবার পর, প্রত্যেক জেনারেলকে অবশ্যই পরাজয় রোধের এই ছয়টি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকতে হয়।

৪

ভুমির প্রাকৃতিক গঠন অবশ্যই যুদ্ধক্ষত্রে একজন সৈনিকের শ্রেষ্ঠ বন্ধু; কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝা, নিজ সেনাদলকে নিয়ন্ত্রন, আর ধুর্তভাবে প্রতিকুলতা, বিপদ এবং দুরত্ব হিসেব করতে পারাতেই একজন জেনারেলের মুন্সিয়ানা। যিনি এসব জানেন, আর যুদ্ধক্ষত্রে তার এই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সিদ্ধহস্ত, তিনি নিশ্চিত জিতবেন। আর যিনি এসব সম্পর্কে জানেন না

অথবা জানলেও বাস্তবে এঁর প্রয়োগ করতে পারেন না , তিনি নিশ্চিত হারবেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সকাল দশটায় ক্যাবিনেট মিটিং এ বসেছেন। উপস্থিত আছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বরন সিং, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, কৃষিমন্ত্রী ফখ্রুদ্দিন আলী আহমেদ, অর্থমন্ত্রী ইশান্ত রাও আর আছেন সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ। শুরুতেই ইন্দিরা পশ্চিম বঙ্গ, আসাম আর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীদের শরনার্থী সমস্যা সংক্রান্ত মেসেজগুলো পড়ে শোনালেন। তারপর মানেকশর দিকে ফিরে বললেন, 'আমি চাইছি, আপনি পুর্ব পাকিস্তানে ঢুকুন।' মানেকশ বললেন, 'আপনি কি জানেন, এঁর মানে যুদ্ধ!' ইন্দিরা বললেন, 'কুচ পরোয়া নেহি।'

মানেকশ বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি বাইবেল পড়েছেন?'

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বরন সিং বললেন, 'এঁর সাথে বাইবেলের কি সম্পর্ক?'

মানেকশ বললেন, 'এই আদি বইএর প্রথম চ্যাপ্টারের, প্রথম প্যারাগ্রাফের, প্রথম লাইনে ঈশ্বর বললেন, ''আলোকিত হও'', অমনি চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল। তেমনি আপনি যদি বলেন, ''যুদ্ধ শুরু হোক'', যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাদের কি ধারণা, আপনারা কি একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? আজ ২৮ এপ্রিল। বরফ গলে হিমালয়ের পথ গুলো খুলতে শুরু করেছে।

এমন সময় যদি চায়নিজরা আল্টিমেটাম দিয়ে বসে, আমাদের কিন্তু দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হবে তখন।'

সর্দার স্বরন সিং আবার মুখ খুললেন, 'চায়নিজরা কি আল্টিমেটাম দেবে নাকি?'

মানেকশ বললেন, 'আপনিই তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনিই বলুন, দেবে কিনা?'

এবার মানেকশ ইন্দিরার দিকে ফিরে বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গতবছর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আপনি চাননি কমুনিস্টরা জিতুক, তাই আপনি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সব শহর গ্রামে ছোট ছোট দলে সেনা মোতায়েন করতে। আমার দুই ডিভিশন সেনা তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই সেকশন আর প্লাটুন হিসেবে এখনো ওখানে মোতায়েন আছে। ন্যুনতম একমাস লাগবে ওদের ইউনিটে ফিরিয়ে এনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে। এছাড়াও আমার একটা ডিভিশন আসামে, অরেকটা অন্ধ্র প্রদেশে, আর আর্মার্ড ডিভিশনটা আছে জানশি-বাবিনাতে। ন্যুনতম একমাস লাগবে এদের ফিরিয়ে এনে সঠিক পজিশনে বসাতে। এদের নড়াতে দেশের প্রত্যেকটা রাস্তা, প্রত্যেকটা রেলগাড়ী, প্রত্যেকটা ট্রাক, প্রত্যেকটা ওয়াগন আমার লাগবে। এই অবস্থায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের ফসল স্থানান্তর অসম্ভব হয়ে যাবে। একারনে দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তখন কিন্তু সবাই কৃষি মন্ত্রীকেই দুষবে, আমাকে না। তাছাড়া আমার আর্মার্ড ডিভিশনে সাকুল্যে তেরটা ট্যাঙ্ক সচল আছে এই মুহুর্তে।'

অর্থমন্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'মাত্র তেরটা কেন?'

মানেকশ জবাব দিলেন, 'কারণ আপনি অর্থমন্ত্রী, তাই। গত দেড় বছর ধরে আমি টাকা চাচ্ছি, কিন্তু আপনি বলছেন, কোন টাকা নেই, তাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এখন এপ্রিলের শেষ। আমি প্রস্তুত হতে হতে পুর্ব পাকিস্তানে বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। আর বর্ষা কালে ওখানে শুধু বৃষ্টি হয়না, যেন আকাশ ভেঙ্গে পানি পরে। নদী হয়ে যায় সাগরের মত, আপনি যদি এক পাড়ে দাড়ান অন্য পাঁড় দেখতে পারবেন না, আর আশেপাশের সব এলাকায় বন্যা শুরু হয়ে যায়। তাই আমার সব মুভমেন্ট রাস্তার ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বিমানবাহিনীও সেভাবে কাজে আসবে না। এঁর এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে পুর্ব পাকিস্তানে ধুকতে বলেন, তো আমি আপনাকে শতভাগ পরাজয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারি। আপনি আমার কতৃপক্ষ, এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আমার জন্য কি আদেশ?'

ইন্দিরা গান্ধী বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলেন এবং মানেকশ কে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা করে জানাতে বলেছিলেন কবে নাগাদ তারা প্রস্তুত হতে পারবে। মানেকশ 'অপারেশন জ্যাকপট' প্ল্যান করেছিলেন, এবং মুক্তিযোদ্ধা আর বাংলাদেশীদের সহায়তায় 'লাইটেনিং কেম্পেইন' এঁর মাধ্যমে ৯৩ হাজার পাক সেনা সহ নিয়াজিকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করেছিলেন।

সানজু বলেন, আপনি যখন নিশ্চিত যে এই যুদ্ধে আপনি জিতবেনই, তখন আপনার শাসক না চাইলেও আপনি লড়তে যেতে পারেন, কারণ জিতে গেলে সবাই আপনাকে বাহবাই

দেবে। কিন্তু আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে এই লড়াই এ জেতার কোন সুযোগই আপনার নেই, সেক্ষেত্রে আপনার শাসক চাইলেও, আপনার উচিত হবে যুদ্ধ এড়ানো; কারণ হেরে গেলে পরাজয়ের সব দায় আপনাকেই নিতে হবে, আর জেনেশুনে অসম্ভব এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার কারণে অসংখ্য মৃত্যুর দায়ে বিবেকের দংশন থেকেও আপনি রেহাই পাবেন না। যে জেনারেল শুধুমাত্র খ্যাতির লোভে অগ্রাভিযান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন, আর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অপমানের কথা না ভেবে নিরাপদে পিছুহটার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; দেশের নিরাপত্তা যার মোক্ষ আর যিনি দেশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ; এমন জেনারেলতো দেশের রত্ন।

৫

জেনারেল হিসেবে আপনি যদি আপনার সৈন্যদের নিজের সন্তানের মত লালন করেন, তাহলে তারা দুর্গমতম স্থানেও আপনার সাথে যাবে, আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে। কিন্তু আপনি যদি নিজে অযোগ্য হন অথবা আপনার কতৃত্ব বজায় রাখতে না পারেন, তাহলে আপনি যতই ভালবাসুন না কেন, আপনার সৈন্যরা কুসন্তানে পরিনত হবে আর তাদের দিয়ে কোন কাজ করানো অসম্ভব।

আপনার সৈন্যরা আক্রমণের জন্য মুখিয়ে থাকলেও, আপনার শত্রুকে আক্রমণ করার মত অনুকুল পরিস্থিতি বিদ্যমান আছে কিনা, তা জানা না থাকলে আপনার বিজয় অনিশ্চিত। একই ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করার মত অনুকুল পরিস্থিতি বিদ্যমান

থাকলেও নিজেদের প্রস্তুতি সম্পর্কে যদি আপনার পস্কার ধারণা না থাকে, তাহলেও আপনার বিজয় আনিশ্চিত। আবার আপনার প্রস্তুতি আর আক্রমণের অনুকুল পরিস্থিতি থাকার পরও আপনি যদি যুদ্ধক্ষত্রের টেরেইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকেন, তাতেও আপনার বিজয় কিন্তু অনিশ্চিত। তাই অভিজ্ঞ যোদ্ধারা যখন এগুতে থাকে তখন কখনো পথ হারায় না আর ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর কখনো লক্ষ্যভ্রস্ট হয়না। এজন্যই বলে, আপনি যদি আপনার নিজেদের আর শত্রুকে ভালকরে জানেন, আপনার বিজয় নিশ্চিত; আর এরসাথে আপনি যদি আবহাওয়া আর টেরেইন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকেন তো আপনার বিজয় হয় সম্পূর্ণ।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29972605

একাদশ অধ্যায়: নয় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি-১

১

৭১০ খীস্টাব্দ। কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা রুমিয়া যখন রাজ অতিথি হয়ে হিস্পেনিয়া সফরে গিয়েছিলেন, হিস্পেনিয়ার লম্পট রাজা রোডেরিক তার শ্লীলতাহানি করেন। কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন আফ্রিকা মহাদেশে নিযুক্ত বাইজান্টাইন ভাইসরয়। উমাইয়াদ খেলাফত তখন খলিফা আল-ওয়ালিদের যোগ্য নেতৃত্বে আফ্রিকার মরক্কো অবধি বিস্তার লাভ করেছে। জঘন্য সেই অপমানের শোধ নিতে কাউন্ট জুলিয়ান তখন আফ্রিকায় নিযুক্ত মুসলিম গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণে প্ররোচিত করলেন। গভর্নর মুসা স্পেন অভিযানের সেনাপতি হিসেবে তারেক বিন যিয়াদকে নিয়োগ দিলেন। কাউন্ট জুলিয়ানের সহায়তায় তারিক মাত্র ৫০০০ সেনা নিয়ে স্পেনের উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দিলেন। ওদিকে রাজা রোডেরিকের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক লাখ। তারেক জানতেন, এই অসম যুদ্ধ জিততে হলে পিছুহটার ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাই স্পেনের মাটিতে পা দিয়েই তিনি সব নৌযান একসাথে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। পরে গুয়াদালেতের যুদ্ধে তারেকের আর্মির কাছে রাজা রোডেরিকের আর্মি হেরে যায়, আর রোডেরিক নিজেও প্রাণ হারান।

ইতিহাসে এই 'তীরে এসে তরী পুড়িয়ে' যুদ্ধের স্ট্রেটেজি কিন্তু একেবারে নতুন না। তারিকের আগেও রোমান পৌরানিক বীর আইনিয়াস, খ্রীস্টের জন্মের আগে চীনা সেনাপতি জিয়াং ইয়ু

আর মেক্সিকো অভিযানে স্প্যানিশ সেনাপতি হার্নান কোর্তেজ এভাবেই তাদের নিজ সেনাদের পয়েন্ট অব নো রিটার্নে নিয়ে গিয়ে তাদের যুদ্ধজয়ের জন্য মরিয়া করে তুলেছিলেন।

যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; আর পরিস্থিতি ভেদে যোদ্ধাদের মনোবলও হয় বিভিন্ন। সেনাপতির কাজই হল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া; আর ব্যবস্থা নিতে, তথা সিদ্ধান্ত গ্রহনে, সেনাদলের মনোভাব যাচাই অত্যন্ত তাতপর্যপুর্ন নিয়ামক। সানজুর মতে, সৈন্য মোতায়েনের প্রেক্ষিতে যুদ্ধে নয় ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

এক. ডিস্পারসিভ বা ছত্রভঙ্গ পরিস্থিতি। যখন একটি আর্মি নিজ দেশের ভেতরে থেকেই লড়াই করে, তখন সেই আর্মির অফিসার আর সৈন্যরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকে। বাড়ি ফিরতে উন্মুখ এই সেনাসদস্যরা যুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়বার পারাক্রম দেখাতে পারেনা আর পিছুহটার মত পরিস্থিতিতে উশৃংখল হয়ে পরে। এমন পরিস্থিতে লড়াই না করাই শ্রেয়।

দুই. ফ্রন্টিয়ার বা সীমান্ত পরিস্থিতি। যখন কোন আর্মি নিজ দেশের সীমান্তের কাছাকাছি শত্রুর দেশের ভেতরে ঢুকে যুদ্ধ করে, তখন পিছুহটা সহজ। এমন পরিস্থিতে নৌকা পুড়িয়ে হোক আর ব্রিজ গুড়িয়েই হোক, সৈন্যদের এই বাস্তবতাটা বঝানো জরুরী যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। এমন পরিস্থিতিতে যেকোন উপায়ে যাত্রা বিরতি পরিহার করে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

তিন. কন্টেনশাস বা কলহময় পরিস্থিতি। যখন দুই পক্ষই এমন একটি সুবিধাজনক অবস্থান দখলের জন্য লড়ছে, যা যে আগে দখল করতে পারবে, সেই জিতবে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত এগিয়ে যান আর আপনার আর্মির পেছনের অংশও যেন সামনের সাথে সমান তালে এগিয়ে আসে তা নিশ্চিত করুন। এরপরও যদি সুবিধাজনক অবস্থান দখলে ব্যর্থ হন, তবে যুদ্ধ এড়িয়ে যান।

চার. ওপেন বা কমুনিকেটিং বা উন্মুক্ত পরিস্থিতি। যখন একটি এলাকার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে উভয় প্রতিপক্ষই সমান সুবিধায় চলাচল করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে শত্রুকে অযথাই অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন না। বরং আপনার নিজের প্রতিরক্ষায় আরো মনযোগী হন।

পাঁচ. ফোকাল বা কেন্দ্রী পরিস্থিতি। যখন পাশাপাশি তিন দেশের সীমানা এক স্থানে মিলিত হয় আর যে আগে এই এলাকায় পৌছায় সেই বাকিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আপনার মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে শক্তিবৃদ্ধি করুন।

ছয়. সিরিয়াস বা সঙ্গিন পরিস্থিতি। যখন কোন আর্মি পেছনে বেশ কিছু বড় শহর পেড়িয়ে শত্রু রাষ্ট্রের রাজধানীর উপকন্ঠে পৌছে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আপনার রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করুন, কেননা মুল যুদ্ধের আগে আপনার পর্যাপ্ত রসদের মজুদ চাই, আর পেছনে ফেলে আসা শত্রু শহরের অবশিষ্ট শত্রুরা

পুনর্গঠিত হয়ে ক্রমাগত আপনার সরবরাহ লাইনে আঘাত হানবে।

সাত. ডিফিকাল্ট বা কঠিন পরিস্থিতি। যখন কোন আর্মি এমন এক দেশে যুদ্ধ করতে ঢুকে যেখানকার ভুমি পর্বত সঙ্কুল অথবা চলাচলের জন্য বন্ধুর। এমন পরিস্থিতিতে মুল সড়কের কাছাকাছি থেকে ধিরেসুস্থে দেখেশুনে এগুবেন।

আট. এন্সার্কেল্ড বা হেমড ইন বা পরিবেস্টিত পরিস্থিতি। যখন এমন এলাকায় লড়তে হয় যেখানে ঢুকতে সংকীর্ন পথ পেরুতে হয়, আর যেখান থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট বাহিনীও বড় বাহিনীকে হারিয়ে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কৌশলী হোন, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের চেয়ে সীমিত চলাচলের পথগুলোর উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলুন।

নয়. ডেথ বা ডেসপারেট পরিস্থিতি। যখন বাঁচার একমাত্র পথ হল লড়াই করে শত্রুকে হারানো। তাই এমন পরিস্থিতিতে সেনাদলকে চাঙ্গা রাখুন আর তারা যেন সাধ্যের শেষবিন্দু দিয়ে লড়তে প্রস্তুত হয় সে ব্যবস্থা করুন।

এই নয় পরিস্থিতি, ঘন এবং বিস্তীর্ন মোতায়েনের সুবিধা, আর মানব চরিত্রের বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতে রনকৌশলে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক জেনারেলের উচিত সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দেয়া।

২

আদ্দিকালে ঝানু জেনারেলরা সবসময় নিশ্চিত করতেন যেন

শত্রুর সম্মুখ আর পশ্চাৎ ভাগ যুদ্ধের সময় একে অন্যের সাথে যোগ দিতে না পারে। তারা নিশ্চিত করতেন যেন শত্রুর ছোট বড় দলগুলো একে অন্যকে সফলভাবে সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়। তারা আরো নিশ্চিত করতেন যেন ভাল যোদ্ধারা যেন অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের রক্ষা করতে না পারে, আর অফিসাররা যেন ঠিকভাবে তাদের দল পরিচালনা করতে না পারে। তারা যেকোন মূল্যে শত্রুকে কন্সেনট্রেশন করতে বাঁধা দিতেন আর কন্সেনট্রেটেড শত্রুকে বিভ্রান্ত করার চেস্ট করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন তখনই তারা কনসেনট্রেট করে এগিয়ে যেতেন, আর পরিস্থিতি অনুকুল না হওয়া পর্যন্ত নানাভাবে বড় ধরনের লড়াই এড়িয়ে যেতেন।

কম্যুনিজম রুখবার দোহাই দিয়ে শক্তিশালী ইউ এস আর্মি ভিয়েতনামে এক অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। উনিশ বছর, পাঁচ মাস, চার হপ্তা আর একদিনের রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রামে প্রায় আট লাখ ভিয়েতনামী প্রাণ হারায়। সমরশক্তির তুল্যবিচারে ইউ এস আর্মির কাছে নস্যি ভিয়েতনাম আর্মি ক্রমাগত উদ্ভাবনী উপায়ে প্রতিপক্ষের শক্তি আর মনোবল ধ্বংস করে দিচ্ছিল। অবশেষে ১৯৭৫ সালে সায়গন পতনের মধ্য দিয়ে তারা চুড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বলা হয়ে থাকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ হল 'ট্যাকটিকাল ডিফিট বাট স্ট্রেটেজিক ভিক্টরি' এঁর এক অনুপম দৃষ্টান্ত!

সানজুর মতে শক্তিশালী শত্রু যখন আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে তখন তাকে রুখবার সবচে আদর্শ উপায় হল শত্রুর

মনোবল নষ্ট করা, যেন সে আক্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করে। চোরাগুপ্তা হামলা করে তার অগ্রাভিযানকে ব্যহত করে, তার সাপ্লাই লাইনে উপর্যুপরি হানা দিয়ে, তার রাস্তায় কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা বসিয়ে, তার সেন্টার অব গ্র্যাভিটিতে বিকল্প উপায়ে আঘাত হেনে শত্রুর ইনিশিয়েটিভ নষ্ট করা যায়।

৩

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জনৈক ফ্রেঞ্চ পাইলট দেখতে পেল প্রায় ১০০ কিঃমিঃ দীর্ঘ জার্মান সাঁজোয়া যানের সারি লুক্সেমবার্গ সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য সে সঙ্গে সঙ্গে তার কতৃপক্ষকে জানিয়েছিল। কিন্তু ফ্রেঞ্চ জেনারেল গেমেলিনকে তখন একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসেছে। সেপ্টেম্বর'৩৯ এ জার্মানদের পোল্যান্ড আক্রমণের পর থেকেই তার সেনাপতিত্বে ফ্রেঞ্চরা জার্মানদের ঠেকাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। গেমেলিন নিশ্চিত জার্মানরা আক্রমণ করবেই, আর সে আক্রমণ হবে ১ম বিশ্বযুদ্ধের 'স্লিফেন প্ল্যান' মোতাবেকই; অর্থাৎ দুর্ভেদ্য মেজিনো লাইন এড়িয়ে জার্মানরা বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ড হয়েই ফ্রান্স আক্রমণ করবে। তারওপর জানুয়ারি মাসে বেলজিয়ামে ক্র্যাশ ল্যান্ড করা জার্মান বিমান থেকে পাওয়া ড্রাফট জার্মান প্ল্যানও তেমনি ইঙ্গিত দিচ্ছিল। গেমেলিন আন্দাজও করতে পারেননি যে জার্মানরা কতটা ধুর্ত হতে পারে।

জার্মান জেনারেল হ্যাডলারের দায়িত্ব ছিল ফ্রান্স অভিযানের প্ল্যান করার, তিনি আদতে 'স্লিফেন প্ল্যান' এঁর আদলেই তার

প্ল্যান সাজিয়েছিলেন। কিন্তু হিটলারের পছন্দ হল আরেক জেনারেল মেনস্টেইনের প্ল্যান। জার্মান আর্মি তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে আক্রমণ করল। গ্রুপ বি গেমেলিনের প্রত্যাশা মত বেলজিয়ান-ডাচ বর্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, গ্রুপ সি থাকল দুর্ভেদ্য ফ্রেঞ্চ প্রতিরক্ষা ব্যুহ মেজিনো লাইন বরাবর ফ্রেঞ্চদের ঠেকাতে। আর গুডেরেইন আর রোমেলের মত জেনারেলদের নিয়ে ফিল্ডমার্শাল রুনস্টেচ তার গ্রুপ এ নিয়ে আর্ডেনের ঘন বনের ভেতর দিয়ে রওয়ানা দিলেন। ফ্রেঞ্চ-বেলজিয়াম সীমান্তে যেখানে মেজিনো লাইনের শেষ সেখানেই এই আর্ডেন ফরেস্টের শুরু, ফ্রেঞ্চরা ভেবেছিল এই ঘন বনের ভেতর দিয়ে পথ করে এসে আক্রমণ করা অসম্ভব। তাদের অপ্রত্যাশিত এলাকা দিয়েই জার্মান মেইন এফোর্ট এগিয়ে গেল। এরপর গুডেরেইন আর রোমেল তাদের প্যাঞ্জার ডিভিশন নিয়ে এতো দ্রুত এগুতে লাগল যে জার্মান কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল হিটলারের কাছে নালিশই করে বসল যে হতচ্ছারা রোমেল লজিস্টিক সাপোর্ট এঁর কোন নিয়মই মানছেন না! জার্মানরা ছয় হপ্তায় ফ্রান্স দখল করে নিয়েছিল।

সানজু বলেন, গতিই হল যুদ্ধের সারকথা। শত্রুর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিতে হবে। শত্রুর অপ্রত্যাশিত পথে এগিয়ে গিয়ে তার অরক্ষিত স্থানে আঘাত করতে হবে। শত্রুদেশের যত গভীরে আপনি ঢুকবেন, আপনার আর্মি তত একতাবদ্ধ হবে, আর কোন প্রতিরোধই আপনাকে থামাতে পারবে না। শত্রুর সম্পদ থেকে আপনার আর্মির রসদ সংগ্রহ করে নিন। আপনার নিজের সৈন্যদের যত্ন নিন, অযথা তাদের ক্লান্ত করা থেকে

বিরত থাকুন, তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখুন, তাদের শক্তি বাঁচান, শত্রুর পিলে চমকে দেয়া সব প্ল্যান করুন আর অনবরত এগিয়ে যান।

আপনার যোদ্ধাদের এমন পরিস্থিতিতে ফেলুন যেন তারা পালানোর চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় ভাবে, আর যার মৃত্যু ভয় থাকেনা সে পারেনা এমন কোন কাজ নেই। এমন পরিস্থিতিতে অফিসার আর সৈনিকেরা ভয়ভীতির উর্ধে উঠে লড়ে। পালাবার পথ খোলা নেই জানলে তারা মরিয়া হয়ে লড়বে। শত্রুদেশের গভীরে তারা এতোটাই একতাবদ্ধ হয়ে যায় যে, প্রয়োজনে তারা শত্রুর সাথে হাতাহাতি করে হলেও জিততে চায়। এমন পরিস্থিতিতে কোন বাড়তি প্রণোদনা ছাড়াই তারা প্রাণপণ লড়ে, কোন শাসন ছাড়াই তারা বিশ্বস্ত থাকে আর স্বপ্রনোদিত হয়েই তারা আপনার ইচ্ছেমত চলে।

আপনার আর্মিতে যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে কোনপ্রকার ভাগ্যগননার অবকাশ রাখবেন না, এমনকি কোন কুসংস্কারকেও প্রশ্রয় দেবেন না। সৈন্যরাও আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই বেঁচে থাকতে চায়, ধনী হতে চায়। যুদ্ধের কথা শুনলে তাদের কেউ কেউ কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু এরাই যখন জানে যে পালাবার কোন পথ নেই তখন মরিয়া হয়ে বীরের মত লড়ে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29972846

একাদশ অধ্যায়: নয় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি- ২

৪

সানজুর সময়ে চাং পার্বত্য এলাকায় শুয়াই-জান নামের এক ধরনের সাপ দেখা যেত, যার লেজে ধরতে গেলে সে ছোবল মারত, ফনায় ধরতে গেলে লেজ দিয়ে আঘাত করত, আর পেটে ধরতে গেলে ফনা আর লেজ দুটো দিয়েই আক্রমণ করত। সানজুর মতে দক্ষ জেনারেলের আর্মি সেই শুয়াই-জান সাপের মতই লড়ে। কারণ তার আর্মির যোগাযোগ ব্যাবস্থা এমন যে, এক অংশে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে আরেক অংশ ওয়াকিবহাল থাকে। তাদের সমন্বয় এতো চমৎকার থাকে যে, এক অংশ যখন সামনে থেকে শত্রুকে ব্যস্ত রাখে তখন অন্য অংশ শত্রুর পাশ দিয়ে অথবা পেছন দিয়ে আক্রমণ করে বসে।

প্রয়োজনের সময় আপাত শত্রুর সাথেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হয়। খ্রীস্টের জন্মের সাড়ে আটশো বছর আগে কারকারের যুদ্ধে এসিরিয়ান রাজা সালমানেসের বিরুদ্ধে ১২ জন আরব রাজার যৌথবাহিনী লড়েছিল। এরপর নেপলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান কোয়ালিশন, ১ম আর ২য় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র আর অক্ষশক্তি, এবং গালফ ওয়ারে সাদ্দামের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন রনাঙ্গনে যৌথবাহিনীর লড়াইয়ের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সানজুর মতে দুই চরম প্রতিপক্ষকেও যদি এক নৌকায় করে নদী পার হতে সম্মত করা যায়,আর মাঝ নদীতে গিয়ে যদি তুফান ওঠে, তখন প্রাণ বাঁচাতে তারা একে অন্যকে এমনভাবে সহায়তা করে, যেন ডান হাত আর বাম হাত

একসাথে কাজ করছে। তাই সব যুদ্ধে পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়ে সৈন্যদের লড়তে বাধ্য করার চেয়ে যৌথবাহিনী গড়ে সহজেই বিজয় অর্জন সম্ভব।

৫

সাদ্দাম হোসেন যখন কুয়েত দখল করে ফেলল, তখন যুক্তরাষ্ট্র উতলা হয়ে উঠল সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিয়ে। দখলদার ইরাকি আর্মির বিরুদ্ধে ইউ এস আর্মির যুদ্ধটাকে কেউ যেন আবার ক্রুসেড না ভেবে বসে, সেজন্য ইউ এস জেনারেল শোয়ার্জকফের নেতৃত্বে একটা বহুজাতিক বাহিনী গঠন করা হল। শোয়ার্জকফ তার বহুজাতিক এই বাহিনীকে পাঁচ ভাগ করে ইরাক সৌদি সীমান্ত বরাবর মোতায়েন করলেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বহুজাতিক মুসলিম সেনাবাহিনীদের নিয়ে গড়া জয়েন্ট ফোর্সেস কমান্ড নর্থ আর জয়েন্ট ফোর্সেস কমান্ড ইস্ট কে বসালেন কুয়েতের ঠিক বিপরীতে; যেন ডিফেন্সে থাকা ইরাকি বাহিনীকে তারা এনগেজ রাখতে পারে। আর পশ্চিমা সেনাদের নিয়ে গড়া দুই কোর নিয়ে তিনি ইরাকের ভেতর দিয়ে ঢুকে কুয়েতকে ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এবার বহুজাতিক মুসলিম সেনাবাহিনীদের নিয়ে গড়া জয়েন্ট ফোর্সেস কমান্ড এঁর হাতে কুয়েত বিজয় করিয়ে দেখালেন। সাপও মারলেন, আর লাঠিও ভাংলেন না আরকি।

সানজু বলেন বাহিনীর সবার মনোবল একটা নির্দিষ্ট মানে উন্নীত রাখা সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব। এই মান নির্ধারন নিশ্চিত করা যেতে পারে ব্যাক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে,

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে, প্রনোদনা দিয়ে অথবা চাপিয়ে দিয়ে। মনের জোর ছাড়া যুদ্ধজয় অসম্ভব। আর এই মনোবলকে কাজে লাগাতে চাই প্রজ্ঞা। কখনো কখনো যুদ্ধে কিছু লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা আত্মহত্যার সামিল, কিন্তু পরিস্থিতির খাতিরে এমন সিদ্ধান্তই হয়ে উঠে জয়ের একমাত্র বিকল্প; এই পরিস্থিতিতে সৈন্যদের মনোবলই বলে দেয় কী সিদ্ধান্ত নেয়া বাস্তবসম্মত।

মনে রাখতে হবে যে সৈন্যদের সবাই একিলিসের মত বীর যোদ্ধা না। কিন্তু একজন জেনারেলকে জানতে হয় কিভাবে প্রত্যেকের সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হয়। কেউ হয়ত সম্মুখযুদ্ধে খুব ভাল যোদ্ধা নন, কিন্তু হতে পারেন ঝানু লজিস্টিশিয়ান অথবা চমৎকার গুপ্তচর কিংবা অব্যর্থ তীরন্দাজ। তার কাজ প্রাকৃতিকভাবে সুবিধাজনক এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল সেনাদের মোতায়েন করিয়ে, শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে ঝুঁকি মোকাবেলা করা। যোগ্য একজন জেনারেল এমন ভাবে তার আর্মি চালায় যে এককভাবে প্রত্যেক সৈন্যের স্কিল লেভেল যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তারা সবাই জেনারেলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে লড়ে যায়।

৬

যুদ্ধে রণ পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর শত্রু প্রতিনিয়ত আপনার পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করে যায়। অন্যের সাথে রণ পরিকল্পনা আলোচনা করলে তা নানান উপায়ে ফাস হয়ে যেতে পারে। জেনারেল হিসেবে সেনাদলের ভেতর সমন্বয় আর

সার্বিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন। আপনার নির্দেশনা আর কার্যক্রম নিয়ে আপনার সৈন্যরা নানান আলোচনা করবে, এ থেকে গুজবের ডালপালা গজায়, আর আপনার শত্রু এইসব গুজবে প্রায়ই বিভ্রান্ত হবে। বিভ্রান্ত শত্রু সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। তাই সানজুর মতে, জেনারেল হিসেবে আপনাকে হতে হবে শান্ত, ন্যায়পরায়ন আর রহস্যময়। প্রয়োজন ছাড়া তার অফিসার আর সৈন্যরা আগে থেকে তার মুল পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা। তার পরিকল্পনা আর সেনাদলের বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি তার শত্রুকে বিভ্রান্ত রাখেন, ক্যাম্প পরিবর্তন করে আর উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনি শত্রুর কাছ থেকে নিজ উদ্দেশ্য গোপন রাখেন।

যুদ্ধের মোক্ষম সময়ে তিনি নৌকা পুড়িয়ে অথবা ব্রিজ গুড়িয়ে দিয়ে তার নিজ আর্মির পিছুহটার সব পথ বন্ধ করে দেন, যেন তারা মরিয়া হয়ে লড়ার ইন্ধন পায়। তিনি তার আর্মি নিয়ে শত্রুদেশের গভীরে চলে যান, যেন কেউ শত্রুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে একা পালাবার সাহস না করে। সেনাদল পরিচালনায় একজন জেনারেল তার আর্মিকে সংগঠিত করেন, প্রেষনা দেন, তাদের লক্ষ্য ঠিক করে দেন আর প্রশিক্ষন দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখেন। উপযুক্ত প্রেষনা পেলে সৈন্যরা যুদ্ধে প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না।

৭

যুদ্ধে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এহেন মৈত্রী একদিকে যেমন আপনার অভিযানের প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে পারে, অন্যদিকে আপনাকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে যুদ্ধ শুরু হলে আপনার বন্ধু প্রতিবেশি রাষ্ট্রটি শত্রুর সাথে হাত মেলাবে না। শক্তিশালী রাষ্ট্র যার অন্যান্য আরো অনেক মিত্র রাষ্ট্র আছে, এমন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে জড়ানো বিপদজনক। কারণ আপনার চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে লাগতে গেলে স্বভাবতই আশেপাশের রাষ্ট্রগুলো ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথেই মৈত্রীতে বেশি সচ্ছন্দ্য বোধ করবে, আর মিত্রহীন অবস্থায় শুধু নিজের সামর্থ্য দিয়ে আপনার পক্ষে বিজয়ী হওয়া দুরূহ।

মৈত্রী আর বশ্যতার পার্থক্য বোঝা জরুরী। উপযুক্ত মিত্রতা যুদ্ধের সময় সহায়তার নিশ্চয়তা দেয়, কিন্তু কোন মিত্র ছাড়াই যুদ্ধে জেতার সামর্থ যদি আপনার থাকে, সেক্ষেত্রে সবসময় আপনি আপনার পরিকল্পনা গোপন রাখুন আর যুদ্ধে নামার আগে আপনার শত্রুকে ক্রমাগত মিত্রহীন করার চেষ্টা করুন।

৮

আপনার আর্মিতে ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি আর অপরাধের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করুন। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত পুরস্কারও দিন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বদলে যুগোপযোগী নিয়মের প্রচলন করুন। সবার মনোযোগের কেন্দ্রে থাকার চেষ্টা করুন আর আপনার অধস্তনদের কাছে প্রত্যাশিত থাকার চেষ্টা করুন। আপনার সৈন্যরা যেন পরিস্কার ভাবে জানতে পারে

তাদের কী করতে হবে, কিন্তু আপনার মুল পরিকল্পনা সময়ের আগেই তাদের কাছে প্রকাশ করে দেবেন না। সবসময় ইতিবাচক সম্ভাবনার বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন, কিন্তু অযথা আশঙ্কার কথা বলে তাদের মনোবল নস্ট করবেন না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেকোন গড়পড়তার আর্মিও আহত বাঘের মত লড়তে পারে। একজন চতুর জেনারেল তার সৈন্যদের এই মানসিকতার পুর্ন সদব্যবহার করতে জানেন।

৯

যেকোন যুদ্ধে সাফল্য নির্ভর করে আপনি আপনার শত্রুর উদ্দেশ্য আর পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে কিভাবে পরিকল্পনা করেন, তার উপর। যুদ্ধে জেনারেলরা কখনো সামনের সারিতে এসে যুদ্ধ করেন না, তাই শত্রুর পার্শ্বদেশ দিয়ে আক্রমণ করলে প্রতিপক্ষ জেনারেলদের কুপোকাত করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। যুদ্ধে একেই বলে চাতুর্য। যুদ্ধে নতুন একজন কমান্ডারের নিজেকে চেনাবার প্রয়োজন আছে, সৈন্যরা যেন তার উপস্থিতি টের পায়, তা খুব জরুরী। এঁর একটা উপায় হল আগেকার কিছু অকার্যকর আদেশ বাতিল করে নতুন ফলপ্রসু আদেশ প্রদান।

জেনারেলদের দৈহিক আর নৈতিকভাবে সাহসী আর দৃঢ়চেতা হতে হয়। শত্রু সুযোগ দেয়া মাত্রই তারা বোঝার চেষ্টা করেন যে এটা কোন টোপ কিনা। তারপর শত্রু তার সে ভুল শুধরে নেবার আগেই তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুর দুর্বলতাকে কব্জা করতে চেষ্টা করুন, একে দরকষাকষি আর

কালক্ষেপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করুন। আপনি যদি নিয়ন্ত্রন করতে পারেন যে কবে কোথায় যুদ্ধ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার জেতার সম্ভাবনা বেশি। অকারনে নিয়ম ভাংবেন না, আর জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে যুদ্ধে জড়াবেন না। যুদ্ধের শুরুতে নিজেকে দুর্বল আর যুদ্ধে অনিচ্ছুক হিসেবে উপস্থাপন করুন, অপেক্ষা করুন শত্রুর ভুল চালের জন্য। তারপর সুযোগ আসামাত্র এমন ক্ষিপ্রতায় শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন যেন সে আর ঘুরে দাড়ানোর সুযোগ না পায়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29974234

দ্বাদশ অধ্যায়: এটাক বাই ফায়ার

১

মেল গিবসন অভিনীত 'দ্য পেট্রিয়ট (২০০০)' মুভির দৃশ্য। সাউথ ক্যারলিনার বিদ্রোহী নেতা বেঞ্জামিন মার্টিন (মেল গিবসন) গিয়েছেন বৃটিশ কন্টিনেন্টাল আর্মির জেনারেল কর্নওয়ালিসের অফিসে দেখা করতে। উদ্দেশ্য কন্টিনেন্টাল আর্মির হাতে ধরা পরা কিছু বিদ্রোহীদের ছারিয়ে নিয়ে যাওয়া। কর্নওয়ালিসের অফিসে যাওয়ার আগে বেঞ্জামিন মার্টিন কিছু খড়ের তৈরি পুতুলের গায়ে বৃটিশ অফিসারদের ইউনিফর্ম পরিয়ে দিয়ে এমন জায়গায় খুটির সাথে বেঁধে রেখে এসেছিলেন, যেন কর্নওয়ালিস চোখে দুরবীন ঠেকালেই খুটির সাথে বেধে রাখা একসারি বৃটিশ অফিসারদের আবছা দেখতে পান। বেঞ্জামিনের এই আয়োজন দেখার পর কর্নওয়ালিস চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বললেন, 'ওদের নাম আর র‍্যাঙ্ক কি?'

জবাবে বেঞ্জামিন মার্টিন বললেন, 'তারা আমাকে তাদের নাম বলেনি। তবে তাদের নয় জন লেফটেন্যান্ট, পাঁচ জন ক্যাপ্টেন, তিনজন মেজর, আর একজন খুব মোটা কর্নেল যিনি আমাকে "চিকি ফেলো" বলে ডাকছিলেন।'

কর্নওয়ালিস উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনি জানেন কোন ভদ্রলোক এমন কাজ করতে পারেন না।'

বেঞ্জামিন মার্টিন জবাব দিলেন, 'আপনার অফিসারদের কাজকর্ম যদি ভদ্রলোক যাচাইয়ের মাপকাঠি হয়, সেক্ষেত্রে

আমি নিজেকে প্রশংসিতই ভাবব। যাহোক, আমি কি এবার আমার লোকদের নিয়ে যেতে পারি?'

বিব্রত কর্নওয়ালিস চিবিয়ে চিবিয়ে জেনারেল ও'হারার উদ্দেশ্য উচ্চারন করলেন, 'আরেঞ্জ দ্য এক্সচেঞ্জ!'

'দ্য পেট্রিয়ট' মুভির বেঞ্জামিন মার্টিন চরিত্রটি আদতে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের জনক ফ্রান্সিস মেরিওনের ছায়া অবলম্বনে তৈরি। ফ্রান্সিস ১৭ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনা রাজ্যে বৃটিশ কন্টিনেন্টাল আর্মির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। গেরিলা যুদ্ধে তার সাফল্যের জন্য তাকে 'সোয়াম্প ফক্স' নামে ডাকা হত। একবার তাকে ধরতে বৃটিশ কর্নেল টার্লেটন জলাভুমির ভেতর দিয়ে টানা ২৬ মাইলেরও বেশি পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন, 'স্বয়ং শয়তানেরও সাধ্য নেই এই বুড়ো শিয়ালটাকে ধরার!'

যাহোক, সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধে চমৎকার সব ট্যাকটিকাল মেনুভার দেখা যায়, কিন্তু অসম যুদ্ধেও কিন্তু কম চমক থাকেনা। ২০০৬ সালের ইসরায়েল বনাম হেজবুল্লাহ যুদ্ধে সুসজ্জিত ইসরায়েলী বাহিনীর বিরুদ্ধে হেজবুল্লাহ সেনাদের কৌশলী যুদ্ধ ছিল সত্যি চমকপ্রদ। ইসরায়েলী বিমান বাহিনীর সামর্থ্যের বিপরীতে তারা তাদের কাতিউশা রকেট লাঞ্চার গুলো কুয়ার ভেতর এমনভাবে বসিয়েছিল যে রকেট ছোড়ার পর ইসরায়েলী বিমান আসার আগেই তারা পুলি টেনে এই লাঞ্চারগুলো কুয়ার গভীরে নিয়ে ওপরটা ঢেকে দিত, আর ইসরায়েলি বিমানগুলো টার্গেট খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরে আসত। হেজবুল্লাহরা দামী

ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের সাথে ট্যাঙ্ক কিনে পাল্লা না দিয়ে স্রেফ রাশান এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল দিয়ে টেক্কা মেরে দিল। তেত্রিশ দিনের এই যুদ্ধ শেষে শক্তিশালী ইসরায়েলী বাহিনী হাল ছেড়ে দিয়ে পিছু হটল। এই যুদ্ধ শেষে জনৈক ইসরায়েলী সৈন্যের স্বীকারোক্তি ছিল, 'হেজবুল্লাহরা হামাস অথবা ফিলিস্তিনিদের মত না। এরা প্রশিক্ষিত আর উন্নতমানের যোদ্ধা। এদের সাথে লড়তে এসে আমরা সবাই বেশ অবাক হয়েছি।'

সানজুর এই অধ্যায়ের নাম 'অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণ।' যুদ্ধে আগুনের ব্যবহার সত্যি ভয়ঙ্কর। কারণ এঁর তাপে যেমন গা ঝলসে যায়, তেমনি ধোয়ার কারণে শ্বাস নিতেও কস্ট হয়। তাছাড়া ধোঁয়ার কারণে খুব বেশিদুর পর্যন্ত দেখাও যায়না, তাই সৈন্যদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পরে সহজেই। আধুনিক যুদ্ধক্ষত্রে এই ইফেক্টগুলোই নিশ্চিত করা হয় নানান ধরনের বোমা-গোলা মেরে। তাই সানজুর অগ্নিসংযোগ বলতে এই সময়ে আপনাকে বিভিন্ন প্রকার আধুনিক বোমা-গোলাবর্ষনকেই বুঝে নিতে হবে। সানজুর মতে পাঁচ উপায়ে আপনি বোমাবর্ষনের মাধ্যমে আক্রমণ করতে পারেন।

এক. শত্রুর ক্যাম্পের ওপর অগ্নিসংযোগ করে তাদের ক্যাম্প তছনছ করে দিতে পারেন। শত্রুর ক্যাম্পে এমন অতর্কিত আক্রমণ তাদের মধ্যে চরম ভীতি আর বিভ্রান্তি সৃস্টি করে।

দুই. শত্রুর খাদ্য আর জ্বালানীর মজুদে অগ্নিসংযোগ করে তাদের ভীষন অসুবিধায় ফেলে দেয়া যায়। কখনো কখনো

এমন আক্রমণের কারণে শত্রু তার পরিকল্পনা বদলাতে, এমনকি পিছু হটতেও বাধ্য হয়।

তিন. শত্রুর সাপ্লাই লাইনে অগ্নিসংযোগ করেও তাকে সিদ্ধান্তহীনতায় ফেলে দেয়া যায়।

চার. শত্রুর গোলাবারুদের মজুদে অগ্নিসংযোগ করতে পারলে একে তো তাদের যুদ্ধের জন্য অপরিহার্য গোলাবারুদে টান পরে, তারউপর গোলাবারুদের মজুদ বিস্ফোরিত হয়ে চারপাশে ভয়াবহ বিপর্যয়ও ডেকে আনে।

পাঁচ. সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণ শত্রু সৈন্যদের সরাসরি হতাহত করে, আর এঁর কলে সৃস্ট ধোঁয়ার কুয়াশা যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয় ভীতি আর বিভ্রান্তি।

২

অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণের জন্য উপযুক্ত উপকরন সবসময় মজুদ থাকা চাই। শুষ্ক মৌসুম এ ধরনের আক্রমণের জন্য উপযুক্ত। বাতাসের গতি আর দিক বোঝাও খুব জরুরী। অনুকুল বাতাসের দিক বুঝে আগুন লাগালে আগুন আর ধোঁয়া শত্রুর দিকে ছুটে যায়। মনেরাখা ভাল যে, বদ্ধ পরিবেশে কিন্তু আগুনের চেয়ে ধোঁয়ার কারণে বেশি প্রাণহানী হয়। অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণের সময় পাঁচটি বিষয়ে তৎপর থাকতে হয়।

এক. ক্যাম্পে আগুন লাগার পর শত্রুদের মাঝে যখন বিশৃংখলা দেখা দেয়, তখনি আক্রমণ করতে হয়। আধুনিক যুদ্ধে

আক্রমণের আগমুহূর্ত পর্যন্ত শত্রু অবস্থানের ওপর টানা গোলাবর্ষন করা হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধে এল-আলামিনের প্রান্তরে জার্মানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারির অপারেশন লাইটফুট শুরুর পুর্বে টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে ৮৮২টা কামান শত্রুর ওপর গোলাবর্ষন করেছিল। মোট গোলার সংখ্যা ছিল ৫,২৯,০০০!

দুই. ক্যাম্পে আগুন লাগার পরও শত্রুদের মাঝে যদি কাঙ্ক্ষিত বিশৃংখলা না দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে শত্রুর প্রস্তুতি বেশ ভাল বলেই অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে প্রত্যাশিত চমক অর্জন করতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। আর প্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণে জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

তিন. আগুনের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন শত্রু সেনারা দিশেহারা থাকে, তাই এটাই আক্রমণের মোক্ষম সময়। আর আগুন যখন নিভু নিভু ততক্ষনে শত্রু নিজেদের ফিরে পেতে শুরু করে, তাই এসময় আক্রমণ না করাই শ্রেয়।

চার. দূর থেকে নিক্ষেপ করে যদি শত্রুর ক্যাম্পে আগুন লাগান যায়, সেক্ষেত্রে ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে আগুন লাগাবার ঝুঁকি না নেয়াই ভাল। আর আগুন লাগানোর পর উপযুক্ত মুহূর্তে আক্রমণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ. বাতাস যেদিকে বয়, আগুন সেদিকেই ধেয়ে যায়। তাই আক্রমণের সময় আগুনের পিছু পিছু এগুতে হয়। বাতাসের গতি যদি অনুকুলে না থাকে, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণের চেষ্টা না করাই ভাল।

অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণের ক্ষেত্রে আগুন নিয়ন্ত্রনের কৌশল জানা আবশ্যক। দিনের কখন কি ধরনের বাতাস বয়ে যায়, তা জানতে হবে। জানতে হবে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান। সর্বপোরি মোক্ষম সময়ের প্রতি নজর রাখতে হবে, যেন কোন সুবর্ন সুযোগ হাতছাড়া না হয়।

৩

ঝড় বৃষ্টির রাতে দেখার আর শোনার ক্ষমতা কমে যায়, তাই এমন আবহাওয়ার সুযোগে আপনি সহজেই শত্রুর খুব কাছে পৌছে যেতে পারেন। খরস্রোতা নদী পার হওয়া কঠিন, তাই নদী সামনে রেখে ডিফেন্স নিলে অনেক সুবিধা। কর্দমাক্ত এলাকা শত্রুর চলার গতিকে শ্লথ করে দেয়। আবার আটকে রাখা পানি হঠাত ছেড়ে দিয়ে শত্রুকে ভাসিয়ে দেয়া যায়। তাইতো আগুনের মত ভয়ঙ্কর না হলেও, কাজে লাগাতে জানলে পানিও কিন্তু কম বিধ্বংসী না।

৪

১৯২১ সালে লিডেলহার্ট আক্রমণের নতুন ধারণা দিলেন। তার মতে আক্রমণ করা যায় দুইভাবে-

এক. ম্যান ইন দ্য ডার্ক রুম কনসেপ্ট। ধরুন আপনি আর আপনার শত্রু দুইজনই একটা অন্ধকার ঘরে আটকা পরে আছেন। কেউ কাউকে দেখতে পান না। তখন আপনি কি করেন? প্রথমে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্ক হন, এইটা হল যুদ্ধে যে কোন আর্মির সহজাত ডিফেন্সিভ পোশ্চার। তারপর একটা হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে শত্রুকে

খুজতে থাকেন, এইটা হল রেকনিসেন্স পর্ব। এরপর শত্রুকে স্পর্শ করা মাত্র আপনি তার কলার চেপে ধরার চেষ্টা করেন, এইটা হল ফিক্সিং দ্য এনিমি। এরপর আপনি তাকে সর্বশক্তিতে আঘাত করেন ধরাশায়ী করতে, একে বলে ডিসাইসিভ মেনুভার। সবশেষে আপনি তাকে পেরে ফেলে কষে বেঁধে ফেলেন, একে বলে এক্সপ্লোয়েটেশন।

দুই. এক্সপান্ডিং টরেন্ট কনসেপ্ট। পানির স্রোত যখন কোন দেয়ালের গায়ে আছড়ে পরে, তখন দেয়ালের ফাটলের ওপর পানির চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। একসময় চাপ এতোটা বেড়ে যায় যে ফাটলের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। একসময় সেই ফাটল বেড়ে দেয়াল ভেঙ্গে যায় আর পানির স্রোতও এগিয়ে যায়। যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সের ফাটল গলে এভাবেই আক্রমণ করতে হয়।

বি এইচ লিডেলহার্ট ছিলেন ইংরেজ সমরবোদ্ধা, আর ১৯২০ সালে যখন তিনি এই থিওরি দুটোর উপর প্রজেন্টেশন দেন তখন তিনি সবে ক্যাপ্টেন। কিন্তু বৃটিশ আর্মি তার কাছ থেকে শিখতে দ্বিধা করেনি অথবা তাকে স্বীকৃতি দিতেও কার্পন্য করেনি। অথচ ২য় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আর্মির সফল ব্লিতজক্রিগ আক্রমণ পদ্ধতি নাকি প্রথম এক ফরাসী ক্যাপ্টেনের মাথায় আসে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ আর্মির সেই বাতিল করে দেয়া পান্ডুলিপি থেকেই নাকি গুদেরেইন ব্লিতজক্রিগ এর বাস্তবায়ন ঘটান। আবার আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে সুয়েজ খাল পেরিয়ে ইসরায়েলী বার্লেভ লাইন অতিক্রম করতে গিয়ে ঈজিপশিয়ান আর্মি

বার্লেভ লাইনের বালির প্রাচীরে আটকে গেল। কোন এক্সপ্লোসিভেই বালির এই দেয়ালের তেমন ক্ষতি হয়না। এদিকে পেছনে একেরপর এক ইউনিট সুয়েজ পাড়ি দিয়ে জমে যাচ্ছে। এমন সময় এক ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন আইডিয়া দিল পানির পাম্প দিয়ে এই বালির দেয়াল ধসানো সম্ভব। ভাগ্যিস ঈজিপশিয়ান হাই কমান্ড আইডিয়াটা নিয়েছিল, আর ঈজিপশিয়ান আর্মিও দ্রুত সিনাই তে ঢুকতে পেরেছিল। সানজু বলেন বিচক্ষণ জেনারেল তার অধস্তনদের প্রতিভার মুল্যায়ন করেন বলেই তার পরিকল্পনায় উদ্ভাবনী চমকের শেষ থাকে না।

৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ডি-ডে তে সফল এম্ফিবিয়াস ল্যান্ডিং শেষে জার্মানদের ধাওয়া করতে করতে মিত্রবাহিনীর রসদে টান পড়েছে। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল আইজেনহওয়ার চাইছিলেন বৃটিশ, আমেরিকান আর কানাডিয়ান সব বাহিনী মিলে একসাথে (মাল্টিপল থার্স্ট) জার্মানির দিকে এগুতে, কিন্তু বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারি গোয়ার্তুমি শুরু করলেন তার বাহিনী নিয়ে একাই সিঙ্গেল থার্স্টে দ্রুত বার্লিনের দিকে এগিয়ে যেতে। অগত্যা আইজেনহওয়ারকে মন্টগোমারির প্রস্তাবিত অপারেশন মার্কেট-গার্ডেন কে হ্যাঁ বলতেই হল।

‘মার্কেট’ ছিল প্যারাট্রুপারদের দিয়ে নেদারল্যান্ডের তিনটা ব্রিজ দখলের পরিকল্পনা আর ‘গার্ডেন’ ছিল ব্রিজ দখলের চার দিনের ভেতর বাদবাকি বৃটিশ সেনাবাহিনীর এগিয়ে গিয়ে

প্যারাট্রুপারদের সাথে যোগ দেবার পরিকল্পনা। তিন ব্রিজের একটা ছিল আর্নহেমে, যা পিছুহটা জার্মানরা বেশ শক্তভাবেই দখল করে রেখেছে বলে গোয়েন্দা তথ্য ছিল। ইন্টেলিজেন্স অফিসার যখন এই তথ্য বৃটিশ কমান্ডার জেনারেল ব্রাউনিং কে জানাতে গেলেন, তখন তিনি তা উড়িয়ে দিয়ে ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে অসুস্থতাজনিত ছুটি যেতে বাধ্য করলেন যেন আর কেউ অপারেশন মার্কেট-গার্ডেন রুখবার কথা ভাবতেও না পারে। 'মার্কেট' ছিল ইতিহাসের সবচে বড় এয়ারবোর্ন অপারেশন, কিন্তু আর্নহেমে জার্মানদের প্রতিরোধের মুখে গোটা অপারেশন মার্কেট-গার্ডেন এমনভাবে ভেস্তে যায় যে, ক্রিসমাস আসার আগেই যুদ্ধ শেষ করার স্বপ্নটা মিত্রবাহিনীর জন্য অধরাই রয়ে যায়।

ক্রিসমাসের আগে যুদ্ধ শেষ করার একটা তাগদা তো মন্টগোমারির ছিলই, আরো ছিল মিত্রবাহিনীর কমান্ডারদের মাঝে অন্যতম সেরা কমান্ডার হিসেবে নিজেকে প্রমান করার অদম্য বাসনা। জেনারেল ব্রাউনিং মুল্যবান গোয়েন্দা তথ্য উপেক্ষা করেছিলেন নাইটহুড পাবার মোহে। আর ব্রাউনিং এর এমন উপেক্ষাকে মন্টগোমারি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন আইজেনহাওয়ারের প্রতি ঈর্ষা আর নিজের পরিকল্পনামত যুদ্ধ নিশ্চিত করতে। অপারেশন মার্কেট-গার্ডেনকে মন্টগোমারি তার অন্যতম বাজে ভুল বলে পরে স্বীকার করে গেছেন। এই অপারেশনে ১৫,০০০ এরও বেশি মিত্রবাহিনী সৈন্য প্রাণ হারায়। সানজু বলেছিলেন, ক্রোধান্বিত হয়ে কোন ভাল শাসক

তার আর্মিকে যুদ্ধে পাঠায় না, আর স্রেফ অহঙ্কারে বশবর্তি হয়ে কোন জেনারেল যুদ্ধে লড়তে যান না।

লাভজনক না হলে অযথাই এগিয়ে যাবেন না, বিশেষ কোন প্রাপ্তি না দেখলে অযথাই বল প্রয়োগ করবেন না, বাধ্য না হলে লড়তে যাবেন না। যুদ্ধে আবেগের বশবর্তি হয়ে নেয়া সিদ্ধান্ত চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহনের আগে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রন করুন। সৈন্যদের মৃত্যুমুখে পাঠানোই জেনারেলের কাজ, কিন্তু এই মৃত্যু যেন অর্থহীন কারণে না হয় তা নিশ্চিত করাও তারই দায়িত্ব। কারণ মৃত ব্যক্তিকে তার প্রাণ যেমন ফিরিয়ে দেয়া যায় না, তেমনি ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজ্যকে আর কখনই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই একজন আলোকিত শাসক হয় পরিনামদর্শী, আর বিচক্ষণ জেনারেল হয় খুব সাবধানী। আর এভাবেই রাস্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে অক্ষুন্ন রাখা যায়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29974609

ত্রয়োদশ অধ্যায়: গুপ্তচর নিয়োগ

১

২য় বিশ্বযুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ মিলিয়ন সৈন্য আর ৩৫ মিলিয়ন বেসামরিক লোক প্রাণ হারায়। ১৯৪৫ সালের হিসেবে খরচ হয় প্রায় এক ট্রিলিয়ন ইউ এস ডলার। কিন্তু জীবন, সমাজ আর অর্থনীতিতে প্রতিটা যুদ্ধের কুপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে আরো অনেক বেশি। পরিনতির কথা না ভেবেই স্বার্থপরের মত যুদ্ধের ডাক দেবার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই নেই। একজন আদর্শ জেনারেল জানেন গৌরব কখনো লক্ষ্য হতে পারেনা, গৌরব হল কৃতকর্মের ইতিবাচক ফলাফল। তাই তিনি চেষ্টা করেন ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে উঠে ন্যুনতম খরচে বিজয় অর্জন করতে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসের এক বনেদি হোটেল থেকে মাতা হারি কে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অত্যন্ত আবেদনময়ী এই ডাচ নর্তকি ছিলেন অনেকের কাংখিতা আর বহুগামী। বহু ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তা, ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ আর হোমরা চোমরাদের সাথে ছিল তার উঠা বসা। কোন সুনির্দিষ্ট প্রমান উপস্থাপন ছাড়াই বৃটিশ আর ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স ক্রমাগত তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে অক্টবর মাসে ফায়ারিং স্কোয়াডে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। একটাই প্রমান গোয়েন্দারা তার বিরুদ্ধে জোগাড় করতে পেয়েছিল, আর তা হল তার ঘরে পাওয়া এক প্রকার রহস্যময় গুপ্ত কালি, যদিও মাতাহারি দাবী

করেছিলেন যে ওটা ছিল তার মেকাপ এর বিশেষ প্রসাধনী। যাহোক ১৯৭০ সালে খোলা জার্মান গোপনীয় দলিলাদি থেকে প্রমানিত হয় মাতাহারি তাদের গুপ্তচর ছিলেন, তার কোড নেম ছিল 'এইচ-২১'।

সানজু বলেন, একমাত্র দুরদর্শিতাই পারে একজন শাসক আর জেনারেলকে বিজয়ী করতে। এই দুরদর্শিতা আধ্যাত্মিক সাধনা থেকেও আসেনা, অভিজ্ঞতা থেকেও না, এমনকি নির্ভুল হিসেব কষেও পাওয়া যায় না। এর জন্য চাই সঠিক তথ্য। শত্রুর সংখ্যা, সামর্থ্য, মোতায়েন আর পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পেলেই শুধুমাত্র আপনি সঠিকভাবে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য চাই উপযুক্ত গুপ্তচর।

চন্দ্রগুপ্ত মুরিয়া ছিলেন মুরিয়ার রাজা আর চানক্যের ছাত্র। তার গুপ্তঘাতক আর গুপ্তচর ব্যবহারের বর্ননা পাওয়া যায় চানক্যের বিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে। প্রাচীন ইজিপসিয়ান, গ্রীক আর রোমানদের মাঝেও গুপ্তচর নিয়োগের দৃষ্টান্ত প্রচুর। বর্তমানে সি আই এ, কেজিবি, মোসাদের মত প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব এসপিওনাজ আছে। সানজুর মতে গুপ্তচর পাঁচ প্রকার।

এক. নেটিভ এজেন্টরা হল যে এলাকায় আপনি যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন সেখানকার স্থানীয় লোক। যুদ্ধের কারণে জনজীবন এমনিতেই অতিস্ট হয়ে যায়। স্থানীয়রা যদি এমনিতেই আপনার শত্রুর ওপর ক্ষিপ্ত থাকে, তাহলে তো কাজ খুব সোজা। অন্যথায় খাবার আর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের কাজে লাগানো যায়। আর একেবারে বেকায়দায় মেরে ফেলার ভয়

দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেইল করেও এদের ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুই. ইন ওয়ার্ড এজেন্ট হল শত্রুর সামরিক অথবা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদের বিপুল পরিমান উৎকোচ দিয়ে অথবা অন্য উপায়ে কিনে ফেলা যায়। এদের অনেকেই নানা কারণে নিজ দেশের সরকার বা প্রশাশনের ওপর নাখোশ থাকে, তাই চেনা সহজ।

তিন. ডাবল এজেন্ট হল শত্রুর গুপ্তচর যে আপনার হয়েও কাজ করে। নিজ স্বার্থেই এরা দুই দিকেই তথ্য বিক্রি করে। তাই নিজেদের তথ্য যতটা সম্ভব এদের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়। এসপিওনাজ জগতে এদের কখনও পুর্ন বিশ্বাসের সুযোগ নেই।

চার. এক্সপান্ডেবলস হল সেই সব গুপ্তচর যারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে আপনার দেয়া ভুল তথ্য নিয়ে ইচ্ছেকরে শত্রুর হাতে ধরা দেয়। শত্রু আপনার ভুল তথ্যের ওপর কাজ করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়, আর আপনি তাকে পরাস্ত করতে পারেন।

পাঁচ. সারভাইভিং বা জীবিত গুপ্তচরেরা আপনার নিয়োগ দেয়া গুপ্তচর যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। সেরা গুপ্তচরেরা সহজে আর লাভজনকভাবে যুদ্ধজেতার মত তথ্য এনে দিতে সক্ষম।

যখন এই পাঁচ ধরনের গুপ্তচরেরা একত্রে কাজ করে, তখন সানজু একে বলেন, ‘মহান রেশমের গুটি।’ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ

পর্যায়ের লোকেরাই শুধু এদের ব্যাপারে জানে। এমন সংস্থা আর তাদের কাজ রাষ্ট্রের সবচে স্পর্শকাতর আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই গুপ্তচরদের সবসময় উন্নত পারিশ্রমিক আর সুবিধাদি দিয়ে রাখতে হয়। গুপ্তচরেরা অবশ্যই অত্যন্ত মুল্যবান অস্ত্র, তাই তাদের উপযুক্ত ব্যবহার আর তদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বের করে আনার মত প্রজ্ঞা থাকা আবশ্যক। এসপিওনাজ পরিচালনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ঘরে বাইরে সবখানে এদের ব্যবহার করা যায়। তাই গুপ্তচরদের ডাবল এজেন্ট হবার ঝুঁকি সম্পর্কে যেমন সজাগ থাকতে হয়, তেমনি তাদের আত্মত্যাগের প্রতিও সহানুভুতিশীল থাকা জরুরী।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গুপ্তচরদের নজরে রাখুন। অপারেশনের আগে আপনার প্ল্যানের নিরাপত্তার খাতিরে এদের সরিয়ে দিন। শত্রু জেনারেল, তাদের স্টাফ অফিসার আর অন্যান্যদের সম্পর্কে আপনার গুপ্তচরেরা আপনাকে যত বেশি তথ্য দেবে, আপনার কাজ তত সহজ হবে। শত্রুর গুপ্তচরদের সনাক্ত করতে চেষ্টা করুন আর খুঁজে পেলে তাদের অত্যাচার না করে কিনে ফেলতে চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে কার্পন্য না করাই শ্রেয়, কারণ সে যদি ডাবল এজেন্ট হতে রাজি হয় তাতে আপনারই লাভ। ডাবল এজেন্টরা উপযুক্ত স্থানীয় আর ইন ওয়ার্ড গুপ্তচর নিয়োগে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও তার তথ্যের ওপর ভিত্তিকরে আপনার গুপ্তচরদের আপনি সঠিকভাবে নিয়োগ করতে পারবেন। সবশেষে, যখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন তাকে ভুল তথ্য দিয়ে শত্রুর কাছে ফেরত দিতে পারেন। তবে ডাবল এজেন্টদের দেয়া তথ্যই সবচে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

এরা সহজাতভাবেই শত্রু সম্পর্কে আপনার গুপ্তচরদের চেয়ে ভাল জানে। মনে রাখা ভাল যে, জেরা করলে আপনি জানতে পারবেন যা আপনি জানতে চান, কিন্তু যদি তাকে কিনে নিতে পারেন তাহলে সে আপনাকে জানাবে যা আপনার জন্য জানা জরুরী।

আপনার সবচেয়ে মেধাবী লোকদের আপনি কোথায় নিয়োগ দেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি তাদের সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাবেন, নাকি অন্যদের প্রশিক্ষিত করতে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন, নাকি গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করবেন? যেকোন যুদ্ধে সিক্রেট অপারেশনের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা চাল এর উপর নির্ভরশীল।

যুগের পর যুগ অভিজ্ঞতা আর সাধনায় লব্ধ প্রজ্ঞা বা উইজডম সবসময়ই এক বিরল অর্জন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই প্রজ্ঞার সঠিক হস্তান্তর রাষ্ট্রের পরম্পরাকে সমুন্নত রাখে; কিন্তু একবার যদি কোনভাবে তা হারিয়ে যায়, তবে রাষ্ট্রের পতন হয়, আর এই প্রজ্ঞা পুনরায় অর্জন করতে দীর্ঘ সময় আর সাধনার প্রয়োজন। তাই যেকোন জাতির অনুজদের জন্য তাদের অগ্রজদের এই কস্টার্জিত প্রজ্ঞাকে ধারন, চর্চা আর লালন করতে না পারার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই নেই!

http://www.somewhereinblog.net/blog/delHkhan/29974727